কৌশিকী কানাড়া

অবধূত

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কৌশিকী কানাড়া

বিষাণ বাজছে।

ঈশানের বিষাণ মুহুর্মুহুঃ ফুকরে উঠছে—জাগো জাগো—

উত্তরপুব কোণায় ঝঞ্ঝা উঠেছে, অতি বিষাক্ত পীত ঝঞ্ঝা। সেই অশুচি ঝঞ্ঝার স্পর্শে আসমুদ্র হিমাচল পীতবর্ণ ধারণ করবে। ফেরাও, ফেরাও, ওখান থেকেই বিদেয় কর ঐ আপদকে। জাগো জাগো—

কেঁদে ফিরছেন ঈশানী। মায়ের কান্না আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ভুখা ভবানী বলি চান। ঘরভেদী বিভীষণদের রুধিরে মায়ের তর্পণ করতে হবে। ঐ রক্তবীজদের রক্ত পান না করা পর্যন্ত করালীর করাল তৃষ্ণা নিবারণ হবে না। ওদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে মায়ের বলিপাত্র সাজাতে হবে। নিশ্চিহ্ন করতে হবে ঐ পাপ দেশের বুক থেকে। বলি দাও, বলি দাও—ঈশানী কেঁদে ফিরছেন।

মহাকাল ঘুমতে পান না। দিন রাত অষ্টপ্রহর জেগে আছেন মহাকাল, তাকিয়ে আছেন ঈশান কোণে, আর ঈশানীর কান্না শুনছেন।

মহাকালকে আমরা ঘুমতে দিই না। নিমকাঠের তৈরী ভারী হাতুড়ি দিয়ে গুনে গুনে ঘা মারা হচ্ছে মহাকালের কপালে, আওয়াজ হচ্ছে ঢং ঢং ঢং। দিনের বেলা বেশী দূর পর্যন্ত পৌঁছয় না সে আওয়াজ, রাতে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সর্বত্র শোনা যায়। যাদের ঘুম হয় না রাতে বা যারা জেগে থাকে বাধ্য হোয়ে, তারা সেই আওয়াজ গুনে রাত মাপে। কতটা খরচা হোল রাতের কতটা বাকী রইল খরচা হোতে, হিসেব করা যায়।

চাকার মত গোল আধ ইঞ্চি পুরু কাঁসা একখানা ঝোলানো আছে অতিবৃদ্ধ নিমগাছটার ডালে। শহরসুদ্ধ সবাই চেনে কারাগারের সামনের সেই গাছটাকে, কারাগারের মত নিমগাছটাও সকলের কাছ থেকে সম্ভ্রম পায়। তার এক হাতে ঝুলছে মহাকালের কপাল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঠিক যাটটি মিনিট পার হোলেই মহাকালের কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ে। যে ব্যক্তি যখন রাইফেল হাতে নিয়ে কারাগারের দরজায় খাড়া থাকে, তার অবশ্যকর্তব্য ঐ ঘা মারা। কারাগারের দরজার পাহারাদার হোল রক্তে মাংসে গড়া জ্যান্ত ঘড়ি, জ্যান্ত ঘড়ির হুঁশিয়ারিতে মহাকাল ঘুমিয়ে পড়তে পান না। ওকেই বলে কপাল—মহাকপাল।

কারাগার থেকে বেশী দূর নয়, নদীর কিনারায় মান্ধাতার আমলের এক অট্টালিকা। অট্টালিকাটি নাকি বম্বেটেরা বানিয়েছিল। একসময় এই শহরটা বম্বেটেদের রাজধানী ছিল। দূরদূরান্তরের শহর গাঁ লুট করে শত শত মানুষ মেয়েমানুষ ধরে আনত তারা পালতোলা জাহাজ বোঝাই করে, সেই জাহাজ এসে ভিড়ত নদীর কূলে। লুটের মাল নামিয়ে জমা করা হোত ঐ অট্টালিকার নীচের তলায়। চমৎকার ব্যবস্থা আছে, একতলার

নীচে আর একটা তলা আছে, নদীর দিকে ফোকর কাটা আছে, সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে সেই মাল ঢোকানো হোত পাতাল গর্ভে। কেনা বেচা যা হবার সব হোত সেখানেই। তারপর আবার সেই পথেই তাদের বার করে নিয়ে দেশদেশান্তরে চালান দেওয়া হোত জাহাজে তুলে, শহরবাসী কেউ কিছু জানতেও পারত না। বর্তমান কালে অট্টালিকাটিতে সরকারের দপ্তরখানা চলে। দিনের বেলা শত শত বাবু বড়বাবু সাহেব বড়সাহেব পিয়ন পেয়াদার ভিড়ে গমগম করতে থাকে জায়গাটা, সন্ধ্যার পরেই খাঁ-খাঁ। তখন একটি মাত্র বুড়ো দরোয়ান চারপাইয়ার ওপর চিৎপাত হোয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে পাহারা দেয়।

সেই বম্বেটেদের আমল বহুকাল আগে চলে গেছে। হাল আমলের বম্বেটেরা জাহাজে চড়ে মানুষ মেয়েমানুষ লুটে আনে না। এখনকার বম্বেটেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বাসনা হোলে শেয়ার মার্কেটে যেতে হবে। অথবা সরকারের দরবারে যারা টেণ্ডার দেয়, টেণ্ডার দিয়ে ঠিকাদারি যোগাড় করে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। এই সভ্য যুগে বম্বেটেরাও সভ্য হোয়ে পড়েছে। তারা এখন দপ্তরখানার অন্তরে ঘুরঘুর করে।

এই সভ্য যুগে, সভ্যতার ভ্রূকুটিকে ফাঁকি দিয়ে কয়েকটি প্রাণী সেই বম্বেটেদের বানানো অট্টালিকার নীচের তলার নীচের তলায় জমা হোয়েছে। নিঃশব্দে অবস্থান করছে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, আর শুনছে সেই আওয়াজ। কারাগারের সামনে মহাকালের কপালে ঘণ্টায় ঘণ্টায় গুনে গুনে ঘা মারা হোচ্ছে।

ঢং ঢং।

দু ঘা মারা হোল। আওয়াজটা ঢুকে পড়ল সেই পাতালগর্ভে।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুরতে লাগল সেখানে, তারপর মিলিয়ে গেল।

সবাই একটু নড়েচড়ে বসল। খুশখুশ খসখস আওয়াজ হোল একটুআধটু। হঠাৎ একবার মাত্র আর এক জাতের আওয়াজ হোল—চটাশ্। সবাই বুঝতে পারল, মশা মারবার জন্যে কেউ নিজের কপালে চড় কষিয়েছে। চড়ের শব্দটা মেলাতে না মেলাতেই ফ্যাঁশ করে আর এক জাতের আওয়াজ হোল আর এক ধার থেকে। সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চোখ মেলে গেল আপনা-আপনি। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভে যেতেই আবার চোখ বন্ধ হোল। তারপর আবার নিস্তব্ধ হোয়ে গেল সেই পাতালপুরী। ঠিক নিস্তব্ধ বলা যায় না, কয়েক লক্ষ মশা পোঁ ধরে রইল সমানে। অন্য প্রাণীগুলোর বুকের মধ্যে মহাকালের ঘড়ি টিকটিক করে চলতে লাগল।

আবার ষাটটি মিনিট কাটা চাই। পুরোপুরি ষাটটি মিনিট পালালে তবে আবার মহাকালের কপালে ঘা পড়বে। এবার পড়বে তিনবার। কিন্তু তাবপর রাত কাবার হোতে আব কতটুকু বাকী থাকবে?

কি হোল!

অনেকের মনে অনেক রকমের 'হয়তো' জেগে উঠতে গিয়েও জাগতে পেল না। সবাই নিজেকে নিজে চোখ রাঙিয়ে শুনিয়ে দিলে একটা চরম কথা—"মনে থাকে যেন, তোমার অভিধানে 'হয়তো' বলে কোনও কথা নেই। তোমার অভিধানের প্রতিটি বাক্য 'অনিবার্য'। যে উদ্দেশ্য নিয়ে বসে আছ তা সফল হবেই। রাত পোয়াবার আগেই হবে, কিছুতেই কথার নড়চড় হবে না।'

অতএব তারা বসে রইল। কান পেতে রইল, প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগল, এই বুঝি মহাকালের কপালে তিন ঘা পড়বে।

তা' আর পড়তে পেল না, অকস্মাৎ সেই পাতালপুরীর অন্ধকার মুখর হোয়ে উঠল। প্রথমে একটু ধস্তাধস্তির শব্দ হোল, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় চাপা আর্তনাদ করে উঠল কে। সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত নিরুদ্বেগ কণ্ঠে খুবই স্পষ্ট ভাবে হুকুম দেওয়া হোল—"মুখ বন্ধ কর, আওয়াজ না করতে পারে।" আর একটা আর্তনাদ উঠতে গিয়েও উঠল না, মাঝখানে একদম বন্ধ হোয়ে গেল।

আবার সেই নিরুদ্বেগ কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল—"বন্ধুগণ, একজন ফালতু অতিথি জুটেছেন আমাদের মধ্যে। ওঁর জন্তেই আমার দেরি হোল আসতে। বেশ কিছুদিন উনি আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করছেন। ওঁর সাহস আছে, বুদ্ধি আছে, আর সব চেয়ে বড় কথা উনি কাজে ফাঁকি দেন না। আমি ওঁর ওপর নজর রাখছিলাম, ওঁর কাজকর্ম দেখে মনে মনে ওঁর প্রশংসা করেছি। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, ওঁর মত মানুষকে হাতছাড়া করা যায় না। তাই আজ ওঁকে আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি।"

একটু চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল যেন, মনে হোল নারীকণ্ঠ সেই হাসির উৎপত্তিস্থল। হাসিটা ছিল বিশ্রী রকম ছোঁয়াচে জাতের, অনেকে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজের নিজের হাসিকে কাসিতে রূপান্তরিত করে ফেললে। যিনি কথা বলছিলেন তিনিও হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি বোঝা গেল তাঁর স্বরে, খুবই উৎফুল্ল কণ্ঠে বলতে লাগলেন—"আপনারা হাসছেন, কথাটা কিন্তু খাঁটি সত্যি। আমিই ওঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ওঁকে সঙ্গে আনতে গিয়ে আমার এতটা দেরি হোল। তা'হলে শুনুন ব্যাপারটা।"

ব্যাপারটা তখন শুনল সকলে।

অনেক দিন থেকে লোকটি লেগে আছে দলের একজন কর্মীর

পেছনে। সে কোথায় যায় কি করে কাদের সঙ্গে মেশে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি জানবার জন্যে লোকটি প্রায় ক্ষেপে উঠেছে। ওকে সেই সুযোগ দেওয়া হোল। সেই কর্মীটি একটি ছোট্ট ব্যাগে দু'জোড়া পিস্তল নিয়ে ট্রেনে চড়ল, লোকটি ঠিক সঙ্গে আছে। কয়েক বার গাড়ি থামল ছাড়ল। দুজনে ঠিক বসে আছে এক গাড়িতে। একটা স্টেশনে ট্রেন থামতেই কর্মীটি ভয়ানক রকম চঞ্চল হোয়ে উঠল, একবার গাড়ির বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আবার গাড়ির ভেতরে নজর ফিরিয়ে কাকে যেন খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে। এই রকম করতে করতে ট্রেনটা ছাড়ল। যেই ট্রেন ছাড়ল, অমনি প্লাটফরমের উল্টো দিকের দরজা খুলে এক জন উঠে পড়ল সেই গাড়িতে। তাকে দেখামাত্রই কর্মীটি লাফ দিয়ে পড়ল প্লাটফরমের ওপর। পড়ে রইল তার সেই ছোট্ট ব্যাগটি গাড়িতে, ব্যাগের মধ্যে পিস্তল কটিও রইল। আর রইল একখানি ছোট কার্ডে লেখা ঠিকানা, কোন্ শহরে কোনখানে সেই পিস্তল কটা পৌঁছে দিতে হবে তা সেই কার্ডে লেখা ছিল।

সেই ফাঁদে পা দিল লোকটি। ব্যাগটি নিয়ে নেমে পড়ল পরের ষ্টেশনে। নাম ঠিকানা লেখা কার্ড ছিল সেই ব্যাগে, তাই তার একদম কষ্ট হয়নি সঠিক স্থানটিকে পৌঁছতে। সন্ধ্যার আগেই উনি পৌঁছে গেলেন নদীর ধারে। স্থানটি বেশ করে দেখে নিয়ে ফিরে গেলেন শহরে, একটা দোকানে ঢুকে ভাল করে খাওয়াদাওয়া করলেন। সেই নিরীহ ব্যাগটি তখনও ওঁর কাছেই আছে। ব্যাগটি হাতে ঝুলিয়ে যেই পা দিয়েছেন পথে অমনি এক দুর্ঘটনা ঘটল। একটা আনাড়ী লোক সাইকেল চড়ে এসে পড়ল লোকটির ঘাড়ের ওপর। ঘটল একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা, সাইকেলওয়ালা পড়ল এক ধারে সাইকেল পড়ল আর এক

ধারে। যিনি সাইকেল চাপা পড়লেন তিনি কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। তাঁর হাতের ব্যাগটা যে কোথায় গেল তা' সেই মুহূর্তে বোঝাই গেল না। একটু পরেই অবশ্য ব্যাগটা খুঁজে পাওয়া গেল, রাস্তার ধারে নালার মধ্যে সেটা পড়ে ছিল ডালা খোলা অবস্থায়। নালায় এককোমর পাঁক, পাঁকের ওপর কয়েকটা কাপড় জামা তোয়ালে মিলল। ওঁকে তখন জিজ্ঞাসা করল সকলে, আর কিছু ছিল কি না। উনি সেই জামা কাপড় তোয়ালে পেয়েই কবুল করলেন যে আর কিছু খোয়া যায়নি। পিস্তল দু'টোর কথা বেমালুম চেপে গেলেন।

সেই ব্যাগ নিয়ে উনি স্টেশনমুখো হোলেন। স্টেশনে গিয়ে ট্রেনেও চাপলেন, নেমে পড়লেন পরের স্টেশনেই। নেমে রিক্শা চেপে ফিরে এলেন এই শহরে। তারপর নদীর ধারে এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলেন অন্ধকারে। রাত এগারটা থেকে তিন ঘণ্টা বসে রইলেন চুপচাপ। দুটো বেজে যাবার পরে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সঠিক স্থানটিতে, এইবার ঢুকে পড়লেই হয়।

এমন সময় ওঁকে আলগোছে তুলে আনা হোয়েছে। এতটা কাছে এসে উনি নিরাশ হোয়ে ফিরে যাবেন, এটা কি একটা কথা হোল!

সমাপ্ত হোল শোনানো। বেশ কিছুক্ষণ বোবা হোয়ে রইল অন্ধকার। তারপর শোনা গেল নারীকণ্ঠ—"কি ব্যবস্থা করা হবে এখন ওর?"

অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হোল তখন নানা কণ্ঠ থেকে—"কে ও? ওর মতলব কি? কারা ওকে লাগিয়েছে? ওর নিজের পরিচয়টাই আগে জানা যাক।"

সেই নিতান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠ তখন হুকুম দিলে—"ওর মুখ খুলে

দাও, নিজের পরিচয় ও জানাক, সত্যি কথা বললে ওকে ছেড়ে দেওয়া হবে।”

অন্ধকার। এমন অন্ধকার যে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সেই লোকটার মুখও কেউ দেখতে পেল না। একটু পরে সবাই বুঝতে পারলে যে তার মুখের বাঁধন খোলা হোয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে দম আটকানো অবস্থায় লোকটা জল চাইলে। কেউ একটু নড়লও না, জল চাওয়ার কথাটা যেন কেউ শুনতেই পেল না। একটু পরে সেই নারীকণ্ঠ মুখর হোয়ে উঠল, বেশ দরদ ঢেলে বলা হোল—“আপনাকে আমরা জল খাওয়াতে পারলাম না। এখানে জল নেই, পাশেই নদী, নদী থেকে জল আনা হবে এমন কিছুও নেই এখানে। আপনি আর একটু কষ্ট সহ্য করুন, তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথার জবাব দিয়ে বেরিয়ে যান, নদী থেকে প্রাণ ভরে জল পান করুন।”

“প্রাণ ভরে!” একজন খুবই ভালমানুষী গলায় বলে উঠল—“প্রাণ ভরে জল পান!”

নারীকণ্ঠ জবাব দিল—“ঐ হোল। ওর মানে যতক্ষণ না ওঁর তেষ্টা মেটে। যাক্‌গে, রাত পোয়াতে বেশী দেরি নেই। এখন আপনি বলুন আপনার পরিচয়। সত্যি পরিচয়টা বলবেন, অনর্থক আমাদের ভোগাবেন না।”

লোকটি পরিচয় দিল। তার নাম যোগজীবন রায়। বহুকষ্টে ‘নিক লেখাপড়া শিখেছে। তারপর বহুদিন বেকার বসে ছিল। ভাই কয়েকটি বোন উপোস করে মরছিল ওধারে। শেষে এই ‘ই পেয়েছে। মাইনে পায়, হুকুম তামিল করে। হুকুমের প, কারও সঙ্গে শত্রুতা করার দরুন সে এ কাজ করছে না।

খা
মা
কাজ
চাকর

"কে মাইনে দেয় ? যে মাইনে দেয় তার পরিচয় কি ?"

বিখ্যাত এক সাহেব কোম্পানির নাম করল লোকটি। সেই কোম্পানির আফিস থেকে সে মাইনে নিয়ে আসে। সেখানকার এক সাহেব শুধু তাকে চেনেন, সেই সাহেবই তাকে কাজের হুকুম দেন। হুকুম তামিল করে কাজের ফলাফল সেই সাহেবকেই জানাতে হয়, তিনিই মাইনে দেন খরচাপত্র দেন।

"সেই সাহেবের সঙ্গে পরিচয় ঘটল কেমন করে ?"

ঐ আফিসে চাকরি খালি আছে জানতে পেরে সে দরখাস্ত দেয়। তাকে ডেকে পাঠানো হয়। অনেক লোক গিয়েছিল, একে একে সকলের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। সাহেবের কাছে গিয়ে সে তার দুঃখদৈন্য জানিয়ে কান্নাকাটি করে। সাহেব তখন বলেন যে তাকে তাঁর নিজের কাজে লাগাবেন। কি মাইনে দেবেন তাও বলেন। তারপর থেকে সে সেই সাহেবের কাজ করছে।

সাহেবের নাম ঠিকানাও লোকটি জানাল। অকপটে সবই জানিয়ে দিলে, কোনও কিছু লুকোবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করলে না।

যিনি লোকটির মুখ খুলে দেবার হুকুম দিয়েছিলেন, তিনি এবার কথা বললেন। তন্দ্রায় গলার স্বর জড়িয়ে আসছে যেন তাঁর। বললেন—"ওকে যেতে দাও এখন। দুজন যাও ওর সঙ্গে, পানসিতে তুলে ওপারে নামিয়ে দিয়ে এস। ওর টাকাকড়ি ঘড়ি কলম সমস্ত দিয়ে দিও। যাও, আর দেরি কোর না।"

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। তারপর মনে হোল যেন ধস্তাধাস্তি শুরু হোয়েছে। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল লোকটা, সেই কান্নার সঙ্গে কয়েকটা কথা শোনা গেল—"না, যাব না। কিছুতেই যাব না আমি, এখানেই মেরে ফেল আমাকে, মেরে

নদীতে ফেলে দাও। পানসিতে তুলে নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে—"

আর শোনা গেল না, তার মুখ বন্ধ করা হোল।

সেই মুহূর্তে নতুন একটি আদেশ শোনা গেল—"ঠিক আছে ছেড়ে দাও ওকে। আমি ওর ভার নিলাম। যোগজীবন রায়, তোমার জীবনের ভয় খুব বেশী। জন্মেছ যখন তখন মরতেই হবে একদিন। যোগজীবন হোলেও জীবনটা একদিন যাবে। তা' তুমি এখন কি করতে চাও?"

যোগজীবন জবাব দিল—"আপনার কাজে লাগান আমাকে, দেখুন পরীক্ষা করে আমি মরতে ভয় পাই কি না।"

চাপা হাসির শব্দ শোনা গেল চারিদিক থেকে। একজন বলে উঠল—"এইমাত্র মরবার ভয়ে কান্না জুড়েছিলে যে জাদু।"

নারীকণ্ঠ থেকে বলা হোল—"থাক এখন ওসব কথা। আমাদের কিন্তু যাবার সময় হোল। আজ আর কোনও কাজ হোল না।"

"হোল বৈকি, যোগজীবনকে পাওয়া গেল"—বেশ একটা বড় গোছের হাই তোলবার শব্দ শোনা গেল। হাই তোলা কর্মটি সুসম্পন্ন করে একেবারে জড়িয়ে জড়িয়ে বক্তা বললেন—"তা'হলে এখন সভা ভঙ্গ হোক। আমার ঘুম পাচ্ছে ভয়ানক, এখনও ঘণ্টাখানেক পরে ভোর হবে। আপনারা সবাই যান, আমি আর যোগজীবন থাকব। আমি একটু ঘুমিয়ে নোব, যোগজীবন জেগে থাকবে। ভোর হোলে আমরা বেরবো। আচ্ছা, আসুন এখন আপনারা।"

আর একটা হাই তোলার শব্দ হোল। তারপর আর কোনও শব্দই শোনা গেল না। যোগজীবন চোখ বুজে চুপ করে বসে রইল।

বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মনে হোল আর এক প্রাণী নেই সেখানে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দু'হাত মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। ঘুরতে ঘুরতে কয়েকটা থামের সঙ্গে ধাক্কা খেলে। শেষে নজর পড়ল ফোকরের দিকে। অন্ধকার তখন ফিকে হোয়ে উঠেছে, এক ফালি ফিকে আকাশ দেখা গেল। আরও কিছুক্ষণ রইল সেখানে সে। আলো ঢুকে পড়ল সেই পাতালপুরীতে। আর একবার ভাল করে খুঁজে দেখল জায়গাটা, না কেউ সেখানে শুয়ে ঘুমচ্ছে না।

বেরিয়ে এল সেই পাতালপুরী থেকে। জল কয়েক হাত সামনে, জল দেখে তেষ্টার কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি নামল গিয়ে নদীতে। হঠাৎ একটা শব্দ হোল—ছপাৎ। ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল, মাথায় গামছা জড়ানো আদুর গা কোমরে এক ফালি নোঙরা নেকড়া পরা একটা লম্বা লোক হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে দড়ি টানছে। কয়েক হাত দড়ি টানতেই জাল দেখা গেল। জাল তুলে হেঁট হোয়ে মাছ খুঁজতে লাগল মেছোটা। কোনও দিকে নজর দেবার তার ফুরসত নেই।

যোগজীবন নদীতে নেমে আঁজলা আঁজলা জল তুলে মুখে মাথায় দিলে। কয়েক আঁজলা জল গিলেও ফেললে। তারপর এধার ওধার তাকিয়ে মেছোটাকে আর দেখতে পেল না।

কোঁচার খুঁটে মুখ মাথা মুছে রাস্তার ওপর উঠে গেল।

মেসার্স হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানির হেড অফিসে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ছোটসাহেব কে. কে. ড্যাট্‌ দস্তুরমত

ঘামছেন। তাঁর সামনে বসে আছেন এক মহিলা, বেশ নিশ্চিন্ত হোয়ে শরীরখানি এলিয়ে দিয়ে বসে আছেন। কোনও তাড়া নেই মহিলাটির, বিন্দুমাত্র উত্তেজিত নন তিনি। বিশ্রাম করতে এসেছেন যেন, বিশ্রাম করার উপযুক্ত স্থান পেয়ে শান্তিতে বসে আছেন। হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানির ছোট সাহেবের খাসকামরা, যেখানে প্রতিটি মিনিটের মূল্য অপরিসীম, সেখানে কাজকর্ম বন্ধ হোয়ে গেছে। মিস্টার ড্যাট্ ঘামছেন, রুমাল বার করে বারদুয়েক ঘাড় কপাল মুখ ঘষে ফেললেন, ঘষে হাত তুললেন বেল বাজিয়ে বেয়ারাকে ডাকবার জন্যে। সুযোগ পেলেন না, মহিলাটি জিভে তালুতে ঠেকিয়ে অদ্ভুত এক আওয়াজ বার করলেন। একটা জাতসাপ যেন হিসহিস করে উঠল। ড্যাট্ সাহেব মহিলাটির চোখের পানে তাকাতে বাধ্য হোলেন। দেখলেন, চোখ দুটিতে দুখানি চকচকে ছুরির ফলা যেন ঝিলিক মারছে। হাত টেনে নিলেন তিনি, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হোয়ে বসলেন। তাঁর কপালের ওপর নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

মহিলাটি বললেন—"আমার দাবী খুব বেশী নয় করুণাকেতন, মাত্র দশ হাজার। ঐ যৎসামান্য টাকার মায়া ত্যাগ করতে তোমার কষ্ট হোচ্ছে! ভেবে দেখ, কত দশ হাজার তুমি পেয়েছ, আরও কত দশ হাজার পাবে। অবশ্য আমার মুখ বন্ধ করতে হবে, নয়ত পাবে না। তার ওপর আর যা হবে তাও হিসেব কর মনে মনে। কম করে হোলেও পাঁচ থেকে আট বছর। এ দেশের সরকার গুলি করে মারবে না এটা ঠিক, কিন্তু তোমার পক্ষে পাঁচ থেকে আট বছর আনন্দ উৎসব স্ফূর্তি মজা ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকাটা কেমন জাতের বেঁচে থাকা হবে, সেটাও ভেবে দেখ। আর—"

ড্যাট্ সাহেব অস্থির হোয়ে উঠলেন, সজোরে ডান হাতখানা ঝাঁকিয়ে বললেন—"শাট্ আপ, চুপ! অত টাকা তোমায় দিতে

পারব না, কারণ অত টাকা আমার নেই। টাকা পেলে যে মুখ বন্ধ করবে তারই বা ঠিক কি? যত সব—''

সোজা হোয়ে বসলেন মহিলাটি। হাতে বাঁধা ঘড়ির পানে তাকিয়ে বললেন—"হ্যাঁ, এবার আমি উঠি। সময় প্রায় হোয়ে এল। তাদের সঙ্গে কথা আছে যে চারটে পনেরো মিনিটে আমি ফোন করব। আমার ফোন না পেলে চারটে সতেরো মিনিটে তারা সঠিক স্থানে সংবাদটি পৌঁছে দেবে। চারটে কুড়ি বা পঁচিশের মধ্যে তোমার এই ঘরের সামনে পাহারা বসে যাবে। পাঁচটার মধ্যে তোমার ডেরা সার্চ হবে। সওয়া চারটে থেকে সওয়া পাঁচটা, এক ঘণ্টার মধ্যেই সর্ব কর্ম শেষ।"

হন্যে কুকুরের মত তাকিয়ে রইলেন ড্যাট্ সাহেব মহিলাটির পানে। মিনিটদুয়েক পরে বললেন—"অতগুলো নগদ টাকা এখনই আমি পাব কোথায়।''

মহিলাটির কণ্ঠে এবার ঝাঁজ ফুটে উঠল। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"সেটাও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? ঐ তোমার ফোন, হাত বাড়িয়ে ডায়েল কর। নগদ টাকা এখনই দিতে পারে এমন বন্ধু অনেক আছে তোমার, বহুবার আমার সামনে ফোন করে তুমি হাজার হাজার টাকা পেয়েছ। তাদের কাউকে ফোন করে বল, তোমার এখানে টাকাটা আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দিতে। সওয়া চারটে পর্যন্ত আমি তোমার সামনে বসে আছি, ভয় কি।"

ড্যাট্ সাহেব নিজের ঘড়ির পানে তাকিয়ে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। তাঁর চোখে মুখে এক রহস্যময় ভাব ফুটে উঠল। মহিলাটি এলিয়ে পড়লেন নিজের চেয়ারে, চোখে মুখে সর্বশরীরে তাঁর এক ছিটে দুশ্চিন্তার ছাপ নেই।

ফোন করা শেষ হোল। খুবই অল্প কথা বললেন ড্যাট্ সাহেব, স্রেফ দশ হাজার টাকা পাঠিয়ে দিতে বললেন। আর বললেন,

মিনিট কুড়ির মধ্যে যেন টাকাটা পৌঁছে যায়। ফোন নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালেন। বারদুয়েক ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"কফি দিতে বলি এখন, বেয়ারাকে ডাকি।"

মহিলাটি বললেন—"কফি আধ ঘণ্টা পরে খেও। আধ ঘণ্টার ভেতর আমি যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, একটা কথা। কথাটা তোমায় বলা উচিত। যোগজীবন রায় মারা গেছে।"

"অ্যাঁ।" চমকে উঠলেন ড্যাট্ সাহেব, তীরের মত সোজা হয়ে বসে রইলেন। তাঁর চক্ষু দুটিতে নিদারুণ আতঙ্ক ফুটে উঠল। মহিলাটি খুবই করুণভাবে বলতে লাগলেন—"হায় রে টাকা। এই যে টাকাটা নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে, এ টাকা ভোগে লাগবে কি না তাই বা কে জানে। যোগজীবনও তোমার কাছ থেকে টাকা পেত, অনেক টাকা দিয়েছ তুমি তাকে। ভোগ করতে পারলে না। কি লাভ হোল তার টাকা রোজগার করে, কি লাভ হোল?"

ড্যাট্ সাহেব সামলে নিয়েছেন ইতিমধ্যে। অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলেন—"কে মারা গেছে বললে? কি হোয়েছিল?"

"যোগজীবন রায়"—কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন মহিলা।

"কে সে? চিনি বলে মনে হচ্ছে না ত।" মুখ নীচু করে ড্যাট্ সাহেব কানের ডগায় হাত দিলেন। কান চুলকে উঠল তাঁর।

শব্দ করে হেসে উঠলেন মহিলা। চিমটিকাটা সুরে বলতে লাগলেন—"কাকে তুমি চেন? আমাকেই কি চেন নাকি? যাকে যখন দরকার পড়ে তখন তাকে চিনতে পার, তারপর তার কথা বেমালুম ভুলে যাও। এইটুকুই তো তোমার সবচেয়ে বড় ক্ষমতা। অথচ মজা দেখ, সেই যোগজীবন তোমার সঙ্গে নিমকহারামি করেনি। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে, কিন্তু হাঁ করেনি। তার শরীরটা পাওয়া গেছে নদীতে, নাক কান কেটে নেওয়া হয়েছে,

হাত পা চিরে দেওয়া হোয়েছে, আরও কি হোয়েছে না হোয়েছে কে বলতে পারে! শেষ পর্যন্ত জান দিয়েছে বেচারা, কিন্তু তোমার নাম করেনি।''

শুনতে শুনতে ছাইয়ের মত সাদা হোয়ে গেল ড্যাট্ সাহেবের মুখ। কোনওরকমে তিনি উচ্চারণ করলেন—"কে সেই যোগজীবন? তুমি তাকে চিনলে কেমন করে?"

"তা' জেনে কি লাভ হবে তোমার করুণাকেতন?'' গভীর দুঃখে মহিলাটির গলা বুজে এল প্রায়। ফিসফিস করে বলতে লাগলেন—"আমার ভুল হোয়েছিল তোমার কাছে তাকে পাঠানো। চাকরি পাচ্ছিল না, শুকিয়ে মরছিল মা বোন নিয়ে। তোমার কাছে পাঠালাম। বলে দিয়েছিলাম তোমাকে সমস্ত কথা জানাতে। কি দুঃখে তার দিন কাটছে, তোমায় সব জানাতে বলেছিলাম। তাতেও যদি তোমার আফিসে তার চাকরি না হয়, তখন আমি নিজে তোমায় ধরব এই মতলব করেছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা করে গিয়ে সে বলল, তার চাকরি হোয়ে গেছে। তুমি তাকে নিজের কাজে নিযুক্ত করেছ। নিশ্চিন্ত হোলাম। তখন কি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে তুমি তাকে যমের গ্রাসে পাঠাবে।"

ড্যাট্ সাহেব হাঁ করলেন কি বলবার জন্যে, বলতে অবকাশ পেলেন না। মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে, টেবিলের ওপর দু'হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললেন—"আমিও মরব, আরও অনেকেই মরবে, তোমার সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠতা করে তাদের মধ্যে এক প্রাণী রক্ষা পাবে না। কি খেলা খেলছ তুমি, বুঝতে পারছ না করুণাকেতন। জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। সরকার তোমার কারসাজির কথা একদিন না একদিন জানতে পারবেই, বিদেশী দুশমনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দেশের সঙ্গে তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা—''

হাতে ঝাঁকি দিয়ে ড্যাট্ সাহেব চাপা গলার হুংকার ছাড়লেন —"শাট আপ, চুপ। বস, মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। সরকারের সঙ্গে আমি লাগছি না, দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি না আমি। সত্যিকারের শত্রুতা করছে যারা আমাদের সরকারের সঙ্গে, সরকারকে লুকিয়ে সরকারের অমতে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করছে, তাদের আমি—"

মহিলাটি বসে পড়লেন চেয়ারে। বসবার আগে জিভে তালুতে মিশিয়ে আর একবার সেই অদ্ভুত শব্দ বার করলেন। তৎক্ষণাৎ ড্যাট্ সাহেবের চোখ মুখের চেহারা পালটে গেল। দরজার বাইরে কে কেসে উঠল একটু। ড্যাট্ বললেন—কম্ ইন্। এক বেয়ারা ঢুকে লম্বা সেলাম দিলে। ড্যাট্ সাহেব দেখলেন, বেয়ারার কোমরে পাগড়িতে এইচ এইচ ছাপ নেই। বেয়ারাটি এগিয়ে এসে টেবিলের কোণায় একটি ছোট প্যাকেট রাখল। একখানি খামে মোড়া চিঠিও দিলে সাহেবের সামনে। সাহেব চিঠিখানি হাতে তুলে মাথা নেড়ে বললেন—"ঠিক হ্যায়।" বেয়ারাটি আর একটি সেলাম নিবেদন করে বেরিয়ে গেল।

খাম খুলে আধ মিনিট চিঠিখানির উপর নজর বুলিয়ে সাহেব বললেন—"ঠিক আছে। ইচ্ছে হোলে ঐ প্যাকেট খুলে দেখে নিতে পার। যা চেয়েছিলে তাই ওতে আছে।"

মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন। প্যাকেটটি তুলে বললেন—"বেশ ভারী। হাতে ঝুলিয়েই নিয়ে যাই। ব্যাগে ঢুকবে না, হাতে ঝুলিয়ে নিলে কেউ সন্দেহও করতে পারবে না এতে কি আছে। আচ্ছা—চলি তা' হলে। এই সামান্য টাকা কটার কথা ভুলে যাও করুণাকেতন। কত টাকা তোমার মিনিটে আসে যায়—"

শরীরে অপরূপ হিল্লোল তুলে বেরিয়ে গেলেন তিনি, মিস্টার ড্যাট্ দাঁতে দাঁত চেপে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সেই ভাবে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক থেকে দশ পর্যন্ত গোনা হোয়ে গেল। তারপর ফোন তুলে বললেন—"রিসেপসন্।" ওধার থেকে সাড়া মিলতে বললেন—"কে যেন বসে আছে আমার জন্যে, দাও তাকে।" কয়েক সেকেণ্ড পরে বললেন—"হাঁ, এই মাত্র যাচ্ছে। সেটা ঝুলিয়ে নিয়েছে হাতে। চিনবে কেমন করে? অরেঞ্জ কলার কাপড়, কালো জামা আর বাঁ হাতের আঙুলে রুবির আংটি। রুবিটা খুব দামী—আচ্ছা—"

ফোন নামিয়ে রাখলেন মিস্টার ড্যাট্, একটি সিগারেট ধরালেন। তাঁর চওড়া চোয়ালটা বেশ শক্ত হোয়ে উঠল।

হপকিন্স অ্যাণ্ড হিলারী কোম্পানীর হেড আফিসের লিফট ওপর থেকে নীচে নেমে এল। দুজন মেয়ে দুজন পুরুষ বেরোলেন লিফ্ট্ থেকে। অরেঞ্জ কলার কাপড় কালো জামা এবং হাতে দামী রুবির আংটি পরা মহিলাটিও নামলেন। ছোট্ট একটি সাদা ব্যাগ, ব্যাগটির ওপর সামান্য একটু সোনালী কাজ, ঝুলছে তাঁর বাঁ হাতে। অত্যন্ত দামী রুবি লাগানো একটি আংটিও রয়েছে আঙুলে। কিন্তু প্যাকেট ফ্যাকেট নেই।

শৌখিন ব্যাগটি দোলাতে দোলাতে মহিলাটি নামলেন গিয়ে পথে, ভিড়ে গেলেন ভিড়ের মধ্যে। একটি বারের জন্যেও পেছন ফিরে তাকালেন না।

রুবির জেল্লায় দু'একজনের চোখ ঝলসে গেল।

রুবির বাঙলা নাম চুনি। তখনকার দিনে বিশেষ বিশেষ পাড়ায় দামী চুনিরা বাস করত। এখন চুনি রুবিতে পরিণত হয়েছে। রুবিরা এখন দামী হোটেলে থাকে। তখনকার চুনিরা ছিল চুনিবালা, রাশি রাশি চুড়ি বালা পরে পানে জর্দায় মুখ ভরতি করে সেই চুনিবালারা চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আবরু

বাঁচিয়ে কারবার চালাত তখন ; এখন রুবি সেন বা রুবি মিত্তির বা রুবি ব্যানার্জিদের আবরু রক্ষা হয় অন্য ভাবে। সবাই আর্টিস্ট— স্টেজ আর্টিস্ট, আফিস ক্লাবের শখের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। অত্যন্ত সম্মান জনক পেশা, বড় বড় অফিসের বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। ইংরাজীর ফোড়ন দিয়ে কথা বলতে হয়। মাঝে মাঝে ডিনার লাঞ্চে যোগদান করতে হয়। সবই অবশ্য কপালগুণে হয়। আফিস ক্লাবের কেরানী বাবুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে কিছুই হয় না। তাঁদের সঙ্গে স্রেফ অভিনয়, রঙ্গমঞ্চের ওপর সবায়ের চোখের সামনে অভিনয়। নেপথ্যের অভিনয় সাহেবদের সঙ্গে করতে হয়, যদি অবশ্য সে রকম কপাল থাকে এবং সে রকম হিম্মত থাকে।

শ্রীমতী রুবি মুস্তাফি নামকরা দেশী হোটেলে বাস করেন। সাহেব পাড়ায় সাহেবী হোটেলে দৈনিক অন্ততঃ পঞ্চাশটে টাকা খরচা করলে যে সুখসুবিধে মেলে, নামজাদা দেশী হোটেলে মাত্র দশটি টাকায় তা' পাওয়া যায়। খাবার অবশ্য ভাত ডাল চচ্চড়ি, তা' খাওয়াক, শ্রীমতী মুস্তাফি দেশী মতে খাওয়াদাওয়া করাটা পছন্দ করেন। তবে মাসে প্রায় আটাশ দিন তিনি নিজের হোটেলে খান না। হরদম তাঁর নেমন্তন্ন থাকে। দিনের বেলা আফিস পাড়ার সাহেবী হোটেলে বসে তিনি লাঞ্চ খান, রাতে আরও বড় হোটেলে ডিনার সমাপন করেন। প্রায় রাতেই রিহার্স্যাল থাকে তাঁর, শনি রবি অভিনয়। রাতে কখন যে ফিরে আসেন হোটেলে, তা' কেউ জানতে পারে না। হোটেলের মালিক শ্রীমতী মুস্তাফিকে যথেষ্ট খাতির করেন। হোটেলের একটি পুরানো চাকরকে তিনি বিশেষ ভাবে নিযুক্ত করেছেন শ্রীমতী মুস্তাফির পরিচর্যায়। যতক্ষণ হোটেলে থাকেন শ্রীমতী ততক্ষণ সেই লোকটা তটস্থ হোয়ে থাকে। রাত এগারটার পর থেকে

তাকে জেগে থাকতে হয়। শ্রীমতী মুস্তাফি রাত এগারটার আগে কোনও দিনই ফেরেন না, ফিরে তিনি স্নান করেন। শীতকালে গরম জল, গরমকালে ঠাণ্ডা জল, স্নানের জলটি এবং স্নানের ঘরটি ঠিকঠাক রাখা চাই। স্নান সেরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেই চাকরটি ছুটি পায়, বেলা আটটা নটার আগে কোনও কাজ নেই। আটটা নটায় শ্রীমতীর ঘুম ভাঙে। তখন চা চাই, চায়ের পরেই স্নানের ব্যবস্থা করা চাই। ঘণ্টা দুয়েক পরে শ্রীমতী বেরিয়ে যান, তারপর রাত সেই এগারটা বারটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত, শ্রীমতী মুস্তাফির ঘরে তালা ঝুলতে থাকে।

সেদিন সেই তালাটিকে দরজার কড়ায় ঝুলতে দেখা গেল না। তখন প্রায় সন্ধ্যা, হোটেল গমগম করছে। যাঁরা আফিস আদালতে কাজ করেন তাঁরা ফিরেছেন। প্রায় প্রতি ঘরেই আলো জ্বলছে। হোটেলের সব কটি চাকর গলদঘম হোয়ে একতলা থেকে চারতলা ছোটাছুটি করছে। হঠাৎ একটি ছোকরা চাকরের নজর পড়ল তিন-তলার তেইশ নম্বর ঘরের দরজার ওপর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, যা দেখছে তা' যেন বিশ্বাস করতেই পারলে না। পা টিপে এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজায় ঠেলা দিলে। ভেতর থেকে বন্ধ। তারপর আর সে দাঁড়াল না, এক দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হোল রান্নাঘরের সামনে। উত্তেজনায় তখন তার দম আটকে এসেছে প্রায়। কোনও-রকমে বললে—"শিগ্‌গির, শিগ্‌গির অঘোর কাকা, শিগ্‌গির—"

অঘোর তখন উবু হোয়ে বসে লুচি বেলছিল। এ সময়টা সে রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করে। ভয় পেয়ে বেলনা হাতে করেই উঠে দাঁড়াল। এক টানে তার হাত থেকে বেলনাটা কেড়ে নিয়ে ছোকরা বললে—"দৌড়ও, শিগ্‌গির যাও, তিনি এসে গেছেন। তেইশ নম্বর ভেতর থেকে বন্ধ—"

কথাটা এমনই বিশ্বাসের অযোগ্য যে রান্নাঘরের যাবতীয় মানুষ হাতের কাজ বন্ধ করে হাঁ করে রইল। বেশীক্ষণ অবশ্য সে অবস্থাটা বজায় রইল না। সামনে পাঁচটা উনুনে হাঁড়ি কড়াই চড়ে আছে। হোটেলের হেড কারিগর জনার্দন, জনার্দনকে কারিগর না বললে সে বেজার হয়। রান্না কাজটাকে সে শিল্পকর্ম বলে মনে করে। জনার্দনের মুখ পান জর্দায় ঠাসা। পিক না চলকে পড়ে এই জন্যে সে ওপর দিকে মুখ তুলে কথা কয়। অদ্ভুত শোনায় তার কথা। জনার্দন বললে—ডাও ডাও, ডেনে এসগে ডি ডাবেন ডিডিমণি" ঐ পর্যন্ত বলে পিকের মায়া ত্যাগ করে ঢোক গিলে বললে—"চারটি ঘি ভাত একটু কোর্মা আর দুখানি ফিশ ফ্রাই, আমার হাতের কাজ একটিবার পরখ করে দেখুন দিদিমণি। তারপর আর কোনও দিন সাহেবী হোটেলের দিকে হাঁটবেন না।"

অঘোর ছুটল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে হোটেলের সব ক'জন চাকর বামুন ঝি, ম্যানেজার বাবু মায় খোদ মালিক পর্যন্ত জানতে পারলেন যে রুম নম্বর তেইশের দরজায় তালা ঝুলছে না, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

সূর্যটা পুব দিকে অস্ত গেল গোছের একটি সংবাদ, সংবাদটি শুনে সবাই কমবেশী আশ্চর্য হোয়ে গেল।

রুম নম্বর তেইশ।

পৌঁছল অঘোর দরজার সামনে। সন্তর্পণে ঠেলে দেখলে, সত্যিই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। তারপর সে করবে কি! ডাকবে দরজায় ঘা দিয়ে! সে কি উচিত হবে! হয়তো মাথা ধরেছে, শরীর খারাপ হোয়েছে হয়তো। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মাথাটা চুলকাতে লাগল সে, কি করা উচিত ঠিক করতে পারল না।

কয়েক মিনিট পরে আস্তে আস্তে কপাট একখানা অল্প একটু

খুলল। ভেতর থেকে ভীষণ রকম চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করা হোল—"কে? দাঁড়িয়ে কে?"

সসম্ভ্রমে জবাব দিল অঘোর—"আজ্ঞে আমি"

"অঘোরকে ডেকে দাও তো একবার"

একটু এগিয়ে গিয়ে অঘোর বলল—"আজ্ঞে, আমি অঘোর। সেই গলার অসুখটা বাড়ল বুঝি? গরম জল এনে দোব?"

"আনগে। আর চা আন, গরম চা দিয়ে ওষুধ খাব।"

"যে আজ্ঞে"—অঘোর ছুটল। সত্যিই গলার অসুখটা বেড়েছে। ভয়ানক বসে গেছে গলাটা, ঐ রকমই হয়। গলার অসুখে মাঝে মাঝে খুবই ভোগেন শ্রীমতী মুস্তাফি। অঘোর থেকে শুরু করে হোটেলের মালিক পর্যন্ত সকলের জানা আছে তেইশ নম্বর ঘরের গলার অসুখের কথা। গলাব অসুখ বাড়লে তেইশ নম্বর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরতে থাকে, যেন একটা পাতিহাঁস ফ্যাঁশ ফ্যাঁশ করছে।

চায়ের কারবার নীচে চলছে। হোটেলে প্রবেশ করার পথটি চায়ের দোকানের ভেতর দিয়ে গেছে বলা যায়। চা তৈরি করতে বলে অঘোর টিপট আনতে ছুটল। তেইশ নম্বরের জন্যে আলাদা টিপট আলাদা কাপ ডিস ম্যানেজারের আলমারিতে আছে। সে আলমারি দোতলায় আফিস ঘরে বসে আছে। তেইশ নম্বরে চা দেওয়া হয় মাত্র একবার বা দুবার সেই সকালবেলায়। তারপর টিপট কাপ ডিস ধুয়ে মুছে অঘোরকে ম্যানেজারের আলমারিতে রেখে দিতে হয়। অসময়ে চায়ের সরঞ্জাম আনতে যেতে ম্যানেজার বাবু খিঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—"ওগুলো নিচ্ছিস কেন? কয়েকটা সোডা পৌঁছে দিগে যা। আর যা লাগবে আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

অঘোর বললে—"গলার ব্যামোটা চাগিয়েছে। চা আর গরম জল দেবার হুকুম হোল।"

ম্যানেজার বললেন—"সেই সঙ্গে দুটো সোডাও দিবি। আমি যাচ্ছি।"

অঘোর নীচে নামতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তটস্থ হোয়ে এক পাশে সরে দাঁড়াতে হোল তাকে, একজন মহিলা তেতলা থেকে নেমে এলেন। চিনতে পারল না তাঁকে অঘোর, মনে করল নতুন কেউ এসেছেন বোধ হয়, কিংবা উনি কারও সঙ্গে দেখা করে গেলেন। হোটেল থেকে বেরিয়ে মহিলাটি উলটো দিকের ফুটপাথে গিয়ে উঠলেন। কালো রঙের ছোট্ট একখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। অঘোর দেখল, সেই গাড়িতে উঠলেন মহিলাটি, গাড়ি চলে গেল।

তারপর চা ভরতি টিপট কাপ ডিস আর বগলে দুই সোডার বোতল নিয়ে উঠল সে তেতলায়। তেইশ নম্বরের সামনে পৌঁছে হতভম্ব হোয়ে গেল। তেইশ নম্বরের দরজার পেটে সেই তালাটি ঝুলছে, যেটি প্রত্যহ ঝুলে থাকে। নীচু হোয়ে ভাল করে নজর ফেলে দেখল অঘোর, দেখে থ হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কাগজে মোড়া চেপটা একটি বোতল হাতে করে ম্যানেজারবাবুও এসে পৌঁছলেন। ব্যাপার দেখে তিনি যৎপরোনাস্তি বেজার হোয়ে বললেন—"যা বাব্বা! শ্লার মেয়েমানুষ জাতের কি মাথার ঠিক আছে।"

আরও খানিক রাতে অভিজাত এক সাহেবী হোটেলে বসে শ্রীকরুণাকেতন ড্যাট্ নিজের মাথাটার সম্বন্ধে ভারী ভাবনায় পড়ে গেলেন। মিস্টার সিংহরায় মিস্টার গুহ মিস অসিতা ঠাকুর মিস গোমা কাপুর শ্রীমতী রুবি মুস্তাফি এবং আরও অনেকে উপস্থিত হোয়েছেন সেখানে। শহর থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে ওঁরা

পিকনিক করতে গিয়েছিলেন, সারাটা দিন খুব হৈ চৈ করে কাটিয়েছেন। হৈ চৈ করার চিহ্ন ওঁদের মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লেপটে রয়েছে।

জনান্তিকে সিংহরায়কে ড্যাট্ সাহেব একটিবার জিজ্ঞাসা করলেন—"রুবি তোমাদের সঙ্গে ছিল, আর ইউ শ্যুয়র?"

সিংহরায় কয়েক ঢোক শুখনো জিন গিলে ফেলে বললেন—"অ্যাব্‌সলিউট্‌লি। নির্ভেজাল আসল রুবি মুস্তাফি, ঐ জামা কাপড়ের অভ্যন্তরে যা আছে"—আরও কয়েক ঢোক গিলে বললেন—"আবরণ উন্মোচন করে যাচাই করবার সুযোগ পেয়েছিলাম কিনা, সুতরাং বাজি ধরতে রাজী আছি—"

ঘুরে গেল ড্যাট্ সাহেবের মাথা, এক ঝাঁক ভিমরুল দেখতে লাগলেন তিনি চোখের সামনে। তা'হলে ঘণ্টা কয়েক আগে তাঁর আফিসঘরে কি ভূতুড়ে কাণ্ড হোল নাকি! হপকিন্স হিলারীর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত আফিসে ভূত এসেছিল! ভূতে নিয়ে গেল অতগুলো টাকা! ভূতেও ধাপ্পা দিতে শিখেছে।

ধাপ্পা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটাতে পারে, ধাপ্পার ধাক্কায় অনেকের চোখ খুলে যায়। মরা বাঁচার অর্থটা তখন পরিষ্কার বোঝা যায়। যোগজীবনের চোখ খুলে গেছে।

যোগজীবন রায় বাড়ি চলে যাচ্ছে। বাড়ি অর্থে স্বগ্রাম, যেখানে তার মা ভাই বোনেরা থাকে। চাকরি করা পোষালো না তার, চাকরিটা ছেড়ে দেওয়াও পোষালো না। মনিবের সামনে উপস্থিত হোয়ে 'চাকরি ছেড়ে দিলাম' বলতেও তার প্রবৃত্তি হোল না। যদিও মনিবটি ছিলেন সোনার মনিব, মুঠো মুঠো টাকা দিতেন, কখনও কোনও কাজের জন্যে তাড়াহুড়া লাগাতেন না।

আর সত্যি কথা বলতে কি, এমন কিছু সাংঘাতিক ধরনের কাজের হুকুমও দেননি মনিব কখনও। দু'একটা লোকের ওপর নজর রাখা, তারা কোথায় যায় কার সঙ্গে মেশে, এই সব সন্ধান নেওয়া। আর মাঝে মাঝে মনিবের জন্যে এটা ওটা কিনে আনা। খুবই শৌখিন মানুষ মনিবটি, পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে ভয়ানক খুঁতখুঁত করেন। দামী পোশাক নামী দোকান থেকে কাচিয়ে এনে পরেন। শহরের অনেকগুলো নামী দোকানে তাঁর পোশাক কাচানো হয়। এক পোশাক একবেলার বেশী পরবেন না, জুতোও হরদম পালটাবেন। সকালের জুতো বিকেলে চলবে না, বিকেলের জুতো পরদিন অচল। হরদম জুতো কিনে যাচ্ছেন, মাসে দু'তিন জোড়া কিনছেনই। ঐ জুতো আর পোশাক নিয়েই যোগজীবনকে প্রায় ব্যস্ত থাকতে হোত। জুতোর নম্বর বলে নামকরা দোকান থেকে যোগজীবনকে জুতো আনতে হোত। পছন্দ হোল না, যাও পালটে আন। তিন চার বার পালটাপালটি করে তবে পছন্দ হবে। আশ্চর্য ব্যাপার হোচ্ছে, নিজে যাবেন না কখনও জুতোর দোকানে, কারণ সময় নেই। কাপড় কাচানোর দোকানে দোকানেও ঘুরতে হোত যোগজীবনকে, ও কাজটাই বা কে করে। শহরসুদ্ধ কাপড় কাচার দোকান চষে বেড়াবার সময় আছে কার! যোগজীবন করত ঐসব টুকিটাকি কাজ। সুখের চাকরি বলা চলে। তবু সে চলে যাচ্ছে চাকরির মুখে লাথি মেরে। হাঁ, এক রকম লাথি মেরেই যাচ্ছে। কারণ যোগজীবন রায় বুঝতে পেরেছে যে ঐ চাকরিটা করার দরুন সে একটা কীটপতঙ্গের সামিল হোয়ে পড়েছে। সে যে একটা মানুষ, এটাও তারা মনে করল না।

তারা কারা, যোগজীবন জানতে পারেনি। তাদের পেশা কি, কি উদ্দেশ্যে তারা গভীর রাতে গিয়ে জুটেছিল নদীর ধারের সেই পাতালগর্ভে তাও সে বলতে পারবে না। তারা তাকে মেরে ফেলতে

পারত। মারেনি, এতই তুচ্ছ মনে করেছিল তাকে যে মারবার দরকার আছে বলেও মনে করেনি। তারা বাঁচায়ওনি তাকে, স্রেফ তার কথা ভুলে গিয়েছিল। ছেলেভোলানো করে সেই অন্ধকারের মধ্যে তাকে ফেলে রেখে তারা চলে গেল, একটা মানুষ বলেও জ্ঞান করল না।

কারণ ঐ দাসত্ব। হুকুম তামিল করার একটা যন্ত্র মাত্র সে। মনিব হুকুম করেছেন, অমুক লোকটার ওপর নজর রাখ, দেখ সে কোথায় কার কাছে যায়, কি করে। যোগজীবন নির্বিচারে হুকুম পালন করতে লেগে গেছে। একটি বারের জন্যে তার মনেও হয়নি প্রকৃত ব্যাপারটা জানবার। মনিবটির মতলব কি, তাও সে জানতে চায়নি। যাদের ওপর তাকে নজর রাখতে হোয়েছে, তাদের মতলব সম্বন্ধেও সে কিছু জানে না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পেরেছে যে তার মনিবের কাজ আইনবিরুদ্ধ নয়, এ পক্ষের কাজকর্ম উদ্দেশ্য সবই বেআইনী। সেই ব্যাগটা, যার মধ্যে ছিল রিভলভারগুলো, রিভলভারগুলো নালার পাঁকে তলিয়ে যায়নি নিশ্চয়ই। সঠিক স্থানে সেগুলো নিশ্চয়ই পৌঁছেছে। সাইকেল চড়ে তার ঘাড়ের ওপর পড়া, ব্যাগটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, তারপর রিভলভারগুলো বার করে নিয়ে সেটাকে নালায় নিক্ষেপ করা, বিলকুল সাজানো ব্যাপার। তারপর তাকে ধরে সেই পাতাল-পুরীতে ঢোকানো, সমস্তই প্রমাণ করছে যে এ পক্ষ আইন মেনে কোনও কর্ম করছেন না। কিন্তু কি কর্ম করছেন এঁরা তাও জানা হোল না। চোর ডাকাতের দল যে নয়, এইটুকু শুধু বোঝা গেল। চোর ডাকাত নয় কেন, তা' বলে বোঝাতে পারবে না যোগজীবন। কিন্তু সে মরে গেলেও মানবে না যে এ পক্ষ চোর ডাকাত। চুরি ডাকাতি ছ্যাঁচড়ামো করার মানুষ ওরা হোতেই পারে না।

ওরা তা'হলে কারা!

চক্ষু বুজে বসে যোগজীবন তাদের কথা ভাবতে লাগল। বসবার জায়গা পেয়েছে সে গাড়িতে, রাত বারটার পরে কাটিহার থেকে গাড়ি ছাড়ল, শিলিগুড়ি পৌঁছতে সকাল হোয়ে যাবে। শিলিগুড়িতে বদল করে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে চড়তে হবে, বাড়ি পৌঁছতে সেই দুপুর। বাড়িতে গিয়ে সে কি বলবে!

মা ভাই বোনগুলোর কথা ভাবতে শুরু করল তখন। একরকম খালি হাতেই বাড়ি চলেছে। ক'দিন বাড়িতে বসে থাকতে পারবে!

অভাবের ভাবনা খুব কড়া দাওয়াই, অভাবের ভাবনায় অন্য সব ভাবনাচিন্তা তলিয়ে গেল।

একটা বুড়ো লোক বসে ছিল তার ডান পাশে। বুড়োটা ঢুলছিল অনেকক্ষণ থেকে, ঢুলতে ঢুলতে তার মাথাটা এসে পড়ছিল যোগজীবনের কাঁধের ওপর। কয়েকবার সে মাথাটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে, নেইআঁকড়া বুড়ো ছাড়বার পাত্র নয়। পাশের লোকের কাঁধে মাথা রেখে সে ঘুমবেই। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে বুড়োর মাথাটা কাঁধের ওপর নিয়েই যোগজীবন চক্ষু বুজে বসে রইল। হঠাৎ তার মনে হোল, কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বলছে বুড়োটা। স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করছে হয়তো, এই ভেবে প্রথমদিকে যোগজীবন বুড়োর কথায় কান দিলে না। একটু পরে তার মনে হোল বুড়োটা তার নাম উচ্চারণ করছে বার বার, আর বলছে—'সাবধান, চমকে উঠ না, নোড় না, যা বলছি শোন।'

বার দু'তিন ঐ কথা শোনবার পরে যোগজীবন নিজের মাথাটা ডান পাশে হেলিয়ে বুড়োর মাথার ওপর একটু চাপ দিল। বুড়ো বলতে লাগল—"রাত আড়াইটে হোল প্রায়, কিষণগঞ্জে দশ মিনিট থামবে। সেই দশ মিনিট এই ভাবে বসে বসে ঘুমবে। গাড়ি

ছাড়লে উঠে দরজার দিকে যাবে। দরজার সামনে যে বসে আছে সে দরজা খুলে রাখবে। প্লাটফরমের শেষ মাথায় যখন পৌঁছবে তখন নেমে যাবে টুপ করে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে দুজন, তারা তোমাকে মোটর গাড়িতে তুলে নিয়ে যাবে। একটি বার চোখ মেলে বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখে নাও। একেবারে কোণায় দুটো চীনে বসে আছে। চিনতে পারবে ওদের নিশ্চয়ই, ওদের দোকান থেকে বহুবার তোমার মনিবের কাপড় কাচিয়ে এনেছ। কায়দা করে ওদের পানে একবার তাকিয়ে চোখ বুজে ঘুমতে থাক। কিষণগঞ্জ থেকে গাড়ি না ছাড়লে চোখ মেলবে না। নামবার সময় ওদের পানে তাকাবে না। তোমার বিছানা বাক্স ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। সাবধান, খুব সাবধান। ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাও। ওরা তোমাকে খুন করতে পারে।"

বুড়ো থামল। গাড়ির চলনও আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠে চোখ মেলে এধার ওধার তাকিয়ে দেখল যোগজীবন। তারপর একটু নড়েচড়ে বসে আবার চোখ বুজল। চমৎকার অভিনয়, কে বলবে যে সে ঘুমচ্ছে না। ঘুমের গুঁতোয় বেচারা আধ মিনিটের বেশী তাকিয়ে থাকতে পারল না।

আধ মিনিটই যথেষ্ট, চিনতে মোটেই কষ্ট হোল না তাদের। আশ্চর্য ব্যাপার বটে! একই গাড়িতে তারা রয়েছে, অথচ যোগজীবন দেখেনি। দেখিয়ে না দিলে দেখতেও পেত না।

বুড়োর ঘুম ভেঙে গেছে ইতিমধ্যে। উঠে দাঁড়িয়েছে সে, এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যে যোগজীবন বুড়োর আড়ালে পড়েছে। মাথার ওপর বাঙ্কে বুড়োর পোঁটলাপুঁটলি রয়েছে। যোগজীবনের মুখের সামনে চেপে দাঁড়িয়ে বুড়োটা তার পোঁটলাপুঁটলির মধ্যে কি যেন খুঁজতে লাগল।

থামল গাড়ি কিষণগঞ্জে, বিস্তর লোক উঠল, অল্প লোকই নামল। গোলমাল ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি চলতে লাগল। গাড়ি ছেড়ে দিলে। যোগজীবন ঘুমচ্ছেই, অত গোলমালেও সে চোখ মেলে তাকাল না। তারপর সে কখন উঠল, গুড়ি মেরে কিভাবে পৌঁছল দরজার সামনে, কেউ দেখতেই পেল না। যে লোকটি দরজার পাশে বসেছিল, সে দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করলে। গলে গেল যোগজীবন সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে। তারপর প্লাটফরম, প্লাটফরমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুটো লোক তাকে তুলে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে।

লোক দুটোর মুখ দেখবার চেষ্টা করল যোগজীবন, সম্ভব হোল না। প্লাটফরমের শেষ প্রান্ত বেশ অন্ধকার। অন্ধকারেও সে বুঝতে পারল যে লোক দুটির বয়েস বেশী নয়। সমবয়সী নয় তারা, একেবারে তরুণ, বড়জোর উনিশ কুড়িতে পা দিয়েছে।

তারা তাকে এক মিনিট দাঁড়াতেও দিল না। একজন বললে —"চলুন শিগ্‌গিব, ঐ দেখুন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।"

যোগজীবন দেখল, সামনে রেলের বেড়ার বাইরে একখানি মোটর গাড়ি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। তিনজনে সেই দিকে পা চালাল।

গাড়ি ছুটছে। পীচঢাকা চমৎকার চওড়া সড়ক, গাড়ির আলোয় রূপোর মত চকচকে দেখাচ্ছে। তার মানে বৃষ্টি হোয়ে গেছে খানিক আগে, পীচের ওপর জল শুখয়নি। দু'পাশে জঙ্গল, বড় বড় গাছ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ছোটবার পরে গাড়ি ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। সামনেই দেখা গেল পোল, পোল পার হোয়ে অল্প

একটু উঠেই জঙ্গল শুরু হোল। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে গেল গাড়ি, হুড়মুড় করে নেমে পড়ল সড়ক থেকে। দারুণ ঝাঁকুনি লাগল, কপালটা ঠুকে গেল সাংঘাতিক ভাবে, চোটগুলো সামলে হাঁ করবার আগেই থেমে গেল গাড়ি। থামল না ঠিক, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে আটকে গেল বললেই ঠিক বলা হয়।

যোগজীবনের ছ'পাশে যে দুজন বসেছিল তারা নেমে পড়ল। সামনে বসে যে চালাচ্ছিল, সে মুখ খুলল সর্বপ্রথম, পাহাড়ী ভাষায় কি বলল, যোগজীবন বুঝতে পারলে না। যারা নেমে গেল গাড়ি থেকে তাদের মধ্যে একজন ওকে ডাক দিলে—"নেমে পড়ুন, হাত পাগুলো চালু করে নিন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের মত বিশ্রাম। এক্সপ্রেস এসে পৌঁছতে অন্ততঃ এখনও তিন কোয়ার্টার দেরি আছে।"

"এক্সপ্রেস!" আশ্চর্য হোয়ে গেল যোগজীবন। হাঁ করল কি বলবার জন্যে, বলতে হোল না। সমস্ত ভাল করে বুঝিয়ে দিলে ওর সঙ্গী। সড়ক ধরে এগিয়ে গেলে কয়েক হাত সামনেই রেললাইন পার হোতে হোত। এক্সপ্রেস এসে সড়ক পার হোয়েই থামবে। আধ মিনিট থেমে আবার চলতে শুরু করবে, আস্তে আস্তে পার হবে একটা পুল, পুলটা জখম হোয়ে আছে। যেখানে রয়েছে ওরা সেখান থেকে পুলটা দেখা যায়। অন্ধকার বলে দেখা যাচ্ছে না। নদীও দেখা যাবে আর একটু এগিয়ে গেলে, কয়েকটা গাছ আড়াল করে রয়েছে। যতক্ষণ না পুল পার হোচ্ছে এক্সপ্রেস ততক্ষণ তাদের লুকিয়ে থাকতে হবে সেখানে। কারণ ঐখানেই তারা নামবে বলে মনে হয়। দিনের আলোয় শিলিগুড়িতে গিয়ে নামতে নিশ্চয়ই সাহস করবে না।

তারা মানে কারা! কারা নামবে এক্সপ্রেস থেকে!

যারা এসেছে যোগজীবনের সঙ্গে এক গাড়িতে, যারা ওকে খুন

করত বোধ হয়। সেই গাড়িই আসছে, দেখা যাক তারা এখানে নামে কি না। যদি নামে, তা' হলে তাদের সঙ্গে নিতে হবে।

প্রায় বোবা হোয়ে গিয়েছিল যোগজীবন। কোনওরকমে তার স্বর ফুটল। জিজ্ঞাসা করল—"সঙ্গে নিতে হবে! কেমন করে! তারা যদি যেতে না চায়—"

ওর আর একজন সঙ্গী খুবই হালকা সুরে বললে—"মতামত প্রকাশ করার মত অবস্থা থাকবে না তাদের তখন। আমরা সঙ্গে নিয়ে যাব, ঠিকানায় পৌঁছে তারা যত খুশি প্রতিবাদ জানাতে পারে। আমরা বাধা দোব না।"

আর কিছু আলাপ আলোচনার অবকাশ মিলল না। মস্ত একটা ফ্লাস্ক হাতে করে গাড়ির চালক নেমে এল। একদম ছেলে-মানুষ সে এবং দস্তুরমত বেঁটে। অন্ধকারেও তার সাদা দাঁতগুলো বেশ দেখা গেল। ওদের তিনজনের নাক বরাবর ফ্লাস্কটা উঁচু করে ধরে বললে—"কাফি, হট্ কাফি"।

"তা'হলে গেলাস বার করি"—বলে একজন গাড়ির মধ্যে মাথা গলিয়ে দিলে।

তাদের সঙ্গেই নেওয়া হোল। অচেতন দেহ দুটো টেনে তোলা হোল যখন গাড়িতে তখন যোগজীবনকেও হাত লাগাতে হোল। সীটের ওপর তাদের স্থান হোল না, পা রাখবার জায়গায় একটার ওপর আর একটাকে চাপানো হোল। তাদের পাগুলোকে দুমড়ে মুচড়ে ভেতরে দিয়ে দেওয়া হোল, নয়ত গাড়ির দরজা বন্ধ করা যায় না। তারপর ওরা তিনজন পাশাপাশি বসল তাদের ওপর পা রেখে। চালক স্বস্থানে আসীন হোলেন। পেছু হেঁটে গাড়ি সড়কের ওপর উঠে এল।

ভোর হোয়ে এসেছে প্রায় তখন। ফিকে আলোয় দেখা গেল, দুটি লোক খানিক আগে সড়কের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। এগিয়ে গিয়ে গাড়ি আবার থামল তাদের সামনে। সামনের দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে তারা ঠাসাঠাসি করে বসল। তারপর দৌড়। অসংখ্য পাখী তখন অসংখ্য রকম সুরে ডাকাডাকি জুড়েছে জঙ্গলের মাথায়, ওরা বোধ হয় নবোদিত আদিত্যদেবের প্রথম কিরণের স্পর্শ লাভ করেছে। নীচেটা তখনও অন্ধকার, গাড়ি হেড লাইট জ্বেলে দৌড়চ্ছে। যোগজীবন বসে আছে দুটো জ্যান্ত মানুষের গায়ের ওপর পা রেখে। খুবই অস্বস্তি হচ্ছে তার, কি করবে, পা তুলে বসবার উপায় নেই। দু'পাশে দুজন সঙ্গী, অতি সাংঘাতিক ধরনের জীয়ন্ত সঙ্গী, তাদের গায়ে পা লাগলে কি জানি কি আবার ঘটে বসবে।

চোখের সামনে যে ঘটনাগুলোকে সে ঘটতে দেখলো, ঐ টুকুটুকু ছোকরা দুইজন নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে যে কর্মগুলো সম্পাদন করে ফেললে, তা' মনে করতে গেলেও তার বুকের ভেতরটা হিম হোয়ে যায়। দু'পাশে দুজন বসে আছে, একান্ত নিরীহ শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের ছেলে দুটি নেহাত গোবেচারার মত চুপ করে বসে আছে, দুজনের শরীরের মাঝখানে তার শরীরটা চেপে রয়েছে। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে ওরা এতটুকু উত্তেজিত হয়নি। ওরা একটু হাঁপাচ্ছেও না। খুব সম্ভব ওরা একদম ভুলে গেছে একটু আগে ওরা কি করে এল। পায়ের নীচে দুটো মানুষ পড়ে আছে, এও বোধ হয় ওদের খেয়ালে নেই। যোগজীবনের শীত করতে লাগল হঠাৎ, সত্যিই সে কাঁপতে শুরু করলে। কাদের পাল্লায় পড়ল সে! কাদের মাঝখানে বসে সে যাচ্ছে!

সামনে যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন বললেন—"লাইট এখন নিভিয়ে দিতে পার পাণ্ডা, বেশ দেখা যাচ্ছে।"

ভয়ানক রকম চমকে উঠল যোগজীবন, ঝুঁকে পড়ে সামনের সীটের পেছনটা দু'হাতে খামচে ধরল।

ওর একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করল—"কি হোল?"

সামনের সীট থেকে বলা হোল—"মুখ বুজে থাক রায়। যখন তখন ঘুম পেয়ে যায় আমার, ঘুম পেলেই ঐ রকম এলিয়ে পড়ে কথা। আর একবার তোমার খুব কাছে বসে হাই তুলতে তুলতে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর আর তুমি আমাকে খুঁজে পাওনি। তাই ও রকম চমকে উঠেছ। বেশ করেছ, এখন মুখ বুজে বসে থাক। তোমার পাশে বসে তোমার কাঁধে মাথা রেখে প্রায় অর্ধেক রাত কাটালাম, আমার ঘুমের বহর তুমি দেখলে। ঐটেই আসল রোগ আমার, যখন তখন যেখানে সেখানে নিদ্রাটি আছে সাধা।"

পেছনের সীট থেকে খিকখিক করে চাপা হাসির শব্দ উঠল।

"আর ওদের ঐ হাসি"—সামনে থেকে আবার শোনা যেতে লাগল ঘুমে জড়ানো এলিয়ে পড়া সুর—"আমার ঘুম আর ওদের ঐ হাসি। এককথায় অতি যাচ্ছেতাই বেহদ্দ আকখুটে অভ্যাস। হ্যাঁ, অভ্যাস। হ্যাবিট হোল সেকেণ্ড নেচার। সুতরাং প্রকৃতি মানে স্বভাব। স্বভাব যায় ম'লে, কথাটি খাঁটি সত্যি। এই যে বাপু তোমরা দুজন দুটি জ্যান্ত লোককে বেহুঁশ করে ফেললে, ওরা দুজন যদি সুযোগ পেত, তা'হলে এতক্ষণে তোমরা কোথায় থাকতে? নীচু হোয়ে ওদের শরীর হাঁটকে দেখ, ছোরা পাবে দুখানি, আশা করি ছোট্ট দুটি রিভলভারও পাবে। আচমকা পেছন থেকে ঠিক টিপ করে ওদের মাথায় রড ঝাড়তে পেরেছিলে বলে এখন খিকখিক করে হাসছ। নয়ত এতক্ষণে তোমাদের ঐ বদ স্বভাব ঘুচত। আর আমাকেও এই গাড়ি চেপে ঢুলতে ঢুলতে যেতে হোত না।"

যোগজীবন বুঝতে পারলে কাজ আরম্ভ হোয়ে গেছে। তার দু'পাশের দুজন সঙ্গী নীচু হোয়ে পায়ের তলার শরীর দুটোকে হাঁটকাচ্ছে। আড়ষ্ট হোয়ে নিজের পা দুখানাকে শূন্যে তুলে রইল সে। মিনিটখানেক বা মিনিট দুয়েক পরে তারা সোজা হোয়ে বসল। একজন বললে—"পাওয়া গেছে।"

সামনে থেকে প্রশ্ন হোল—"কি কি পাওয়া গেল?"

যোগজীবনের ডান পাশে যে বসেছিল সে জবাব দিলে—"যা যা বলেছিলেন, ছোরা পিস্তল আরও দু'একটা জিনিস—"

এবার বেশ আরামের হাই তুলে আকথুটে ঘুমে আচ্ছন্ন সুরে হুকুম হোল—"সাবধানে রাখ, পিস্তল গুলো লোড করা আছে, সাবধান।"

যোগজীবন নামালো তার পা দুখানাকে আবার, আলতো করে না রেখে এবার দস্তুরমত জোরে চেপে রাখল। বেশ বুঝতে পারল, জুতোর মধ্যে তার পায়ের তলা তেতে উঠেছে।

কেন ওরা পিস্তল ছোরা নিয়ে এসেছে? কে ওদের পাঠিয়েছে? এমন কি অন্যায় অপরাধ করেছে সে যে তাকে খুন করতে হবে?

মনিবকে মনে পড়ল। সদাশয় শৌখিন খোশমেজাজী ভদ্রলোক, কখনও চড়া সুরে কথা বলেন না, অতবড় একটা বিলাতী কোম্পানির দেশী সাহেব, তিনি পাঠিয়েছেন ওদের! দূর, তাও কি কখনও হোতে পারে!

চীনে দুটোকে কিন্তু সে চিনতে পেরেছে। সম্ভ্রান্ত পোশাক ধোলাইয়ের দোকানের কর্মচারী ওরা, কর্মচারী কেন, মালিকও হোতে পারে। চীনের দোকানে কে মালিক কে কর্মচারী বোঝা যায় না। ওদের দোকান থেকে বহুবার মনিবের পোশাক ধুইয়ে এনেছে সে। কিন্তু ওরা যে তাকে খুন করার মতলবে তার সঙ্গ নিয়েছে—

ভাবনায় বাধা পড়ল। খুন হোতে হোতে কোনওরকমে রক্ষা পেলে আবার। হঠাৎ প্রায় ওলটাতে ওলটাতে খানিকটা নেমে গেল গাড়িখানা, শেষে বেশ খানিকটা লাফিয়ে উঠে থেমে গেল। রক্ষা পেল সবাই। সর্বাগ্রে ড্রাইভার কি যেন বললে তার নিজের ভাষায়। ড্রাইভারের পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সাবাস দিলেন। বললেন—"সাবাস সাবাস! একেই বলে বাহাদুরি, নোড়ানুড়ি টপকে গাড়ি একনিশ্বাসে জলের কাছে পৌঁছে গেছে। এই গাড়ি যারা বানিয়েছিল, তারা বিলেতে বসেও এখন টের পেয়েছে, গাড়ি কার পাল্লায় পড়েছে, সেখানে তাদের হাড়গোড়-গুলো পর্যন্ত মড়মড়িয়ে উঠল।"

"কিন্তু এদের যে হুঁশ ফিরে আসছে"—যোগজীবনের পাশ থেকে একজন বলল। যোগজীবন বুঝতে পারলে, পায়ের তলায় জীব দুটো যেন ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে।

"তা'হলে ওদের মুখ হাত বেঁধে ফেলতে হবে। পাণ্ডা নাম, দড়িটড়ি সব বার করে ফেল।"

অতঃপর সবাই নামল এবং চীনে দুটোর হাত মুখ পরিপাটি করে বাঁধা হোয়ে গেল।

মুখের মধ্যে ছোট্ট একটি রবারের বল পুরে একখণ্ড কালো সিল্কের কাপড় দিয়ে মুখটা বাঁধা হোয়েছে। অদ্ভুত কায়দায় এবং অত্যাশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন হোল কর্মটি। থুতনির নীচে দিয়ে মাথার ওপর দিয়ে কয়েকবার পেঁচানো হোল, তারপর কয়েক ফের দেওয়া হোল ঠোঁটের ওপর দিয়ে মাথার পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। নাক চোখ খোলা রইল, শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে লাগল সমানে। বলতে গেলে একটুও অসুবিধে বোধ হোল না। পাকা

হাতের কাজ, দেখতে দেখতে মনে হোল ড্যাট্‌ সাহেবের যে ওরা যেন মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কর্মটি কোনও হাসপাতাল থেকে শিখে পাশ করে এসেছে।

মুখ বাঁধার আগেই হাত দুখানিকে পেছন দিকে নিয়ে বাঁধা হোয়ে গিয়েছিল। সেও ঐ কালো সিল্কের ফালি দিয়ে। হাত পা মুখ বাঁধবার জন্যে উপযুক্ত সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসেছিল তারা, কাজেই কাজের কোনও অসুবিধে হোল না। বাঁধাছাঁদা হোয়ে যাবার পরে একটা চেয়ারের ওপর খাড়া করে বসিয়ে দেওয়া হোল ড্যাট্‌ সাহেবকে। তারপর তারা আপন কাজে মন দিলে। সাহেব চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন।

প্রথমে তারা পোশাক রাখার আলমারি দুটো খুলে সবকটি পোশাক বার করে কয়েকটা পোঁটলা বাঁধলে। তারপর জুতোগুলো সব বার করে একটা বড় সুটকেশে পুরে ফেললে। ড্যাট্‌ সাহেব দেখলেন, দড়ি বেঁধে জানলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হোল সেগুলো। জানলার অবস্থা দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তিনি। আধুনিক ফ্যাশনের জানলা, লোহার ফ্রেমে কাঁচ লাগানো ছিল। কাঁচসুদ্ধ ফ্রেমটিকে খসিয়ে নিয়ে এক পাশে রেখে দেওয়া হোয়েছে। জানলা গলিয়ে আলমারি টেবিলও অনায়াসে নামিয়ে দেওয়া যায়।

টেবিল আলমারি তারা নামালো না। কাপড়চোপড় জুতো জামা যা ছিল সমস্ত নিলে। আর নিলে কাগজপত্র, কাগজপত্র বলতে এক টুকরো কিছু ফেলে রাখলে না। সামান্য কয়েক শ' টাকা ছিল, সেগুলো ছুঁলোও না। ব্যাঙ্কের বই উলটে পালটে দেখে রেখে দিলে। সাহেবের দামী ঘড়ি দামী কলমও ফেলে রেখে গেল আসলে তারা পোশাক পরিচ্ছদ নিতেই এসেছিল, টাকাকড়ি নিতে আসেনি। তাই পোশাক পরিচ্ছদ নিয়েই সন্তুষ্ট হোল।

সমস্ত মাল নীচে নামাবার পরে একজন বাদে সবাই সেই

জানলাপথেই অদৃশ্য হোল। যিনি রইলেন তিনি তখন লোহার ফ্রেমটিকে যথাস্থানে তুলে স্ক্রু এঁটে দিলেন। তারপর ড্যাট্ সাহেবের মুখে মাথায় জড়ানো সিল্কের কাপড়টা খুলে ফেললেন। মুখ থেকে রবারের বলটা উগরে ফেললেন সাহেব। এতক্ষণ পরে তাঁর কথা বলবার মত অবস্থা হোল। কিন্তু বলতে হোল না কিছুই, হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তাঁর মুখের ওপর ঝাপটা মারল। হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন তিনি, শ্বাস নিয়েই ঢলে পড়লেন। তারপর তাঁর ঘরে কি হোল না হোল কে তার খবর রাখে।

সকালে যখন তিনি সজাগ হোলেন, তখন রাতের ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলে মনে হোল। মাথা ঝিমঝিম করছিল, হাত পাগুলো অবশ। কোনওরকমে শয্যা ত্যাগ করে সর্বাগ্রে আলমারি দুটো খুলে দেখলেন। যা দেখলেন, তারপর স্বপ্নটাকে স্বপ্ন বলে মনে করতে পারলেন না। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে, মতলব এঁটে ফেললেন মনে মনে। মতলবটি হোল, কাউকে কিছু জানাবেন না তিনি, কিল খেয়ে কিল হজম করবেন। তারপর পালাবেন :

অতঃপর কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে ডাকতে হবে। তাঁর হুকুম ছিল, তিনি না ডাকলে তাঁর ঘরে ঢুকে প্রাতঃকালীন চা দেওয়া যাবে না। বেয়ারাকে ডাকবার জন্যে হাত বাড়িয়ে কলিং বেলটা টিপতে হবে। কিন্তু বেয়ারা ঘরে ঢুকলেই যে সব জানাজানি হোয়ে যাবে।

যেখানে তিনি থাকেন সেটি একটি অভিজাত শ্রেণীর বোর্ডিং হাউস। তাঁর মত আরও কয়েকজন দেশী সাহেব এক এক ঘরে বাস করেন। ওঁরা ওটির নাম দিয়েছেন ক্লাব ক্লাসিক। ক্লাসিক ক্লাব এমন পাড়ায় এমন স্থানে অবস্থিত যে যানবাহনের শব্দ সেখানে পৌঁছয় না। বাগান পুকুর টেনিস কোর্ট সুদ্ধ কয়েক বিঘা জমির মাঝখানে ক্লাসিক ক্লাব, উঁচু মেজাজ এবং উঁচু দরের পছন্দ

যাঁদের তাঁরাই ক্লাসিক ক্লাবে বাস করেন। শুধু পয়সার জোর থাকলেই ঐ ক্লাবে স্থান পাওয়া যায় না। ড্যাট্‌ সাহেব তাঁর প্রিয় ক্লাবটির কথাও ভেবে দেখলেন, একটা কেলেঙ্কারি হোয়ে গেছে, চোর ঢুকে ক্লাসিক ক্লাব থেকে এক মেম্বারের যথাসর্বস্ব নিয়ে গেছে, এ রকমের একটা তৃতীয় শ্রেণীর সংবাদ রটলে ক্লাবের মর্যাদা থাকবে না। কি করে সব দিক সামলানো যায়!

যাবে, নিশ্চয়ই যাবে। সর্বাগ্রে এক প্রস্থ পোশাক চাই। একটিবার বেরতে পারলেই বিলকুল ব্যবস্থা করে ফেলবেন তিনি। হতভাগা চোরগুলো একটা পোশাকও যে রেখে যায়নি, লোকগুলোর কমন্‌সেন্স বলেও কোনও পদার্থ নেই।

পোশাক সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে হঠাৎ একজনকে মনে পড়ে গেল তাঁর। কয়েকখানা ধুতি পাঞ্জাবি চাদর আছে তার কাছে। সাহেবী পোশাক সে বরদাস্ত করতে পারে না তাই ওগুলো কিনেছিল। তার সঙ্গে কোথাও যেতে হোলে ধুতি পাঞ্জাবি পরতে হয়, সেবার ওয়ালটেয়ারে গিয়ে সেই সব পরেই তিনি কাটিয়েছেন। সেগুলো রেখে দিয়েছে সে, আবার যদি কখনও কোথাও যেতে হয় তার সঙ্গে, তখন কাজে লাগবে।

ড্যাট্‌ সাহেব একটু একটু যেন চাঙ্গা হোয়ে উঠলেন তার কথা মনে পড়ার দরুণ। তার কাছে তিনি শুধু কেতন, মিস্টার ড্যাট্‌ নন। সাহেবিয়ানা তার কাছে অচল। তবু তাকেই ডেকে পাঠাতে হবে, নয়ত উপায় নেই। চারিদিক থেকে যে রকম দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠছে, তাতে এখন কিছুদিন গা ঢাকা দেওয়াই উচিত। এমন এক-জনকে চাই, যার কাছে থাকলে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তিনি। সেরকম ব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণা ছাড়া আর কে আছে।

অতঃপর মনস্থির করে ফেলতে দেরি হোল না। বেয়ারাকে ডেকে ক্লাবের নাম ঠিকানা ছাপা কাগজ আনিয়ে চিঠি দিলেন

কৃষ্ণাকে। লিখে দিলেন, কাপড় জামাগুলো নিয়ে তখনই যেন সে চলে আসে। তার নিজের জামা কাপড়ও আনতে লিখলেন। কারণ সেই দিনই সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়তে হবে। আর ভাল লাগছে না খাটতে। এ কথাও লিখলেন যে তিনি বিছানায় পড়ে থাকবেন যতক্ষণ না কৃষ্ণা এসে তাঁকে তুলবে।

বেয়ারাকে বলে দিলেন ট্যাক্সি নিয়ে যেতে। যাঁকে চিঠি দিলেন, তিনি আসবেন তাঁর মালপত্র আসবে। তিনি এলে পর চা খাবেন। শরীর খারাপ, তিনি না আসা পর্যন্ত শয্যাত্যাগ করবেন না।

বেয়ারা ছুটল।

ঠিক পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে মালপত্র নিয়ে হাজির হোল কৃষ্ণা। জিনিসপত্র গুছিয়ে আসবার জন্যে তৈরী হোয়ে বসে ছিল যেন সে। করুণাকেতন আশ্চর্য হোয়ে গেলেন একটু। চাদরের তলায় শুয়ে তিনি দেখতে লাগলেন কৃষ্ণাকে, ঘরে ঢুকেই কৃষ্ণা কাজে লেগে গেল। দুটো চামড়ার ব্যাগ ঘরের মধ্যে রেখে বিদায় হোল বেয়ারা, সঙ্গে সঙ্গে দরজার চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে এল কৃষ্ণা। তারপর জানলাগুলোর পাল্লা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিতে লাগল। করুণাকেতন তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মনে হোল কৃষ্ণার বডিটা অত্যন্ত বেশী পরিমাণ সজীব। সজীব না বলে সজাগও বলা যায়। ইংরেজী কথাটা হোল রিস্পন্‌সিভ্, করুণাকেতন ওই রিস্পন্‌সিভ্ কথাটার সঠিক বাঙলা কি হবে বুঝতে পারলেন না। ওই রকমের শরীর খুব কম মেয়েরই আছে। শরীরের মধ্যে যেন রহস্যময় একটা চুম্বকশক্তি সদাসর্বক্ষণ জেগে রয়েছে, আকর্ষণ করবেই। সে আকর্ষণকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে উঠল। সেই আবছা অন্ধকারে আরও রহস্যময় করে তুলল কৃষ্ণার শরীরখানিকে। করুণাকেতন বললে—"ও কি হচ্ছে? জানলাগুলো বন্ধ করছ কেন?"

কৃষ্ণা বলল—"ঘুমব"

"ঘুমবে!"

"ঘুমবার জন্যেই তো ডেকে পাঠিয়েছ।"

"ধ্যেৎ"

"তা ছাড়া আর কি সম্বন্ধ আছে আমার সঙ্গে তোমার? সম্বন্ধ এই শরীরটার সঙ্গে, তুমি নিজেই বলেছ।"

"আমি বলেছি!"

"বলনি মুখে, কাজে প্রমাণ দিয়েছ। বার কর না সেই ফোটো গুলো, সেই যে একটা চীনে ফোটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলিয়েছিলে। এতটুকু কাপড় রাখতে দাওনি আমার শরীরে। বলেছিলে, নশ্বর জিনিসটাকে অবিনশ্বর করে ধরে রাখছ। কোথায় গেল সেগুলো? সেগুলো দেখেও যখন তোমার তেষ্টা মেটে না তখন ডেকে পাঠাও। তাই তৈরী হোয়ে এলাম।" বলতে বলতে কৃষ্ণা শাড়িখানা খুলে ভাঁজ করে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখলে। জামাটাও খুলে ফেললে। করুণাকেতনের কিন্তু সেদিকে নজর নেই। এক লাফে বিছানা থেকে নেমে একটা আলমারি খুলে কি যেন খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন তিনি। একটার পর একটা দুটো আলমারিই খুলে ফেললেন। আলমারি দুটোর এক ধারে পোশাক ঝোলাবার ব্যবস্থা, আর এক ধারে কতকগুলো ছোট বড় ড্রয়ার। ড্রয়ার-গুলো টেনে নামিয়ে উলটে ফেললেন, কিচ্ছু নেই। গোটাকতক খালি সেন্টের শিশি, কয়েকটা পাউডারের কৌটো, পুরনো মনিব্যাগ দু'একটা ছাড়া আর কিছুই পেলেন না। যেখানে যা কিছু লুকনো ছিল সব অন্তর্ধান করেছে।

পাগলের মত ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন করুণাকেতন, সুটকেশ ব্যাগ বাক্স যা পেলেন হাতের কাছে খুলে উলটে ফেলতে লাগলেন। বিছানার কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসে দেখতে লাগল কৃষ্ণা, একটি কথাও বললে না। শেষে হয়রান হোয়ে পড়লেন বোধ হয় করুণাকেতন, বসে পড়লেন একখানা চেয়ারে, দু'হাতে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে হেঁট হোয়ে রইলেন।

আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়াল কৃষ্ণা, কানের কাছে মুখ দিয়ে চুপি চুপি বললে—"সব গেছে তো ?"

করুণাকেতন জবাব দিলেন না।

"আপদ গেছে," দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে মুখ ঘষতে ঘষতে কৃষ্ণা বললে—"রাজ্যের জঞ্জাল জুটিয়েছিলে, বিদেয় হোয়েছে সব, আপদ গেছে।"

উঠে দাঁড়ালেন করুণাকেতন, চেয়ারখানাকে টেনে সরিয়ে দিলেন এক পাশে। দু'হাত কৃষ্ণার দুই কাঁধের ওপর রেখে বেশ কিছুক্ষণ তার চক্ষু দুটির মধ্যে তাকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলেন। কৃষ্ণা বুঝতে পারল, বার দুই ভীষণ রকম কেঁপে উঠলেন যেন তিনি। তারপর বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন—"স্ট্রেঞ্জ! অদ্ভুত!"

মাথাটি এক পাশে হেলিয়ে মুখখানি তুলে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা, ঠোঁট দুখানি নড়ে উঠল তার। করুণাকেতন কিছু শুনতেই পেলেন না। দু'হাতে কৃষ্ণার মাথাটাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে তার চুলের মধ্যে নিজের মুখখানা গুঁজে দিয়ে বলতে লাগলেন—"কিছু না, কিছু না, ভুলে যেতে দাও। সমস্ত আমায় ভুলিয়ে দাও, সব ভুলিয়ে দাও। তুমি পারবে, তুমি আমায় বাঁচাতে পারবে।"

ঘণ্টাখানেক পরে বেয়ারার ডাক পড়ল। চায়ের সময় অনেকক্ষণ পার হোয়ে গেছে। হুকুম হোল, তুজনের মত খাবার আনতে হবে। ক্লাব ক্লাসিকে সকালে চা ব্রেকফাস্ট মেলে, সন্ধ্যায় চা মিলতে পারে আগে থাকতে হুকুম দিলে। ওখানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা লাঞ্চ ডিনার বাইরে খান। তাই বাইরে থেকে খাবার আনাতে হোল। কৃষ্ণা বলে দিলে, কোনখান থেকে কি কি জিনিস আনতে হবে। লুচি আলুর দম ডাল দই মিষ্টি নিয়ে আসতে হবে শুনে বেয়ারা বাবাজী হতভম্ব হোয়ে গেল। কিন্তু হুকুম হোল হুকুম, যা পালন করাই হোল বেয়ারার ধর্ম। ছুটল সে হুকুম তামিল করতে, ভাবতে ভাবতে গেল যে সাহেবের মাথা খারাপ হোয়ে গেছে। মাথা খারাপ না হোলে ক্লাব ক্লাসিকে কেউ লুচি সন্দেশ আনবার ফরমাশ করে।

করুণাকেতন স্নান করে ধুতি চাদর পরে ফেললেন। কারুকার্য করা হালকা চটি পায়ে দেন তিনি রাত্রে, সেই চটি জোড়াই শুধু ফেলে রেখে গেছে চোরেরা। তাই পায়ে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হোল তাঁকে। তৃপ্তি ব্যাপারটার সঙ্গে সন্তুষ্ট হোয়ে থাকা ব্যাপারটার কোথায় যেন একটা যোগাযোগ আছে। প্রায় প্রতি রাতেই আকণ্ঠ হুইস্কি বোঝাই করে, ঐ হুইস্কিবোঝাই একটা বা তুটো নারীদেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠেন তিনি, নারীদেহ তাঁর কাছে অভিনব পদার্থ নয়। টাকা খরচা করলে ও বস্তু কেনা যায়, এবং যদৃচ্ছা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সেই হুল্লোড়ের অন্তে অতৃপ্তির হলাহল মনমেজাজ বিষিয়ে তোলে, অবসাদ ছাড়া আর কিছু সঞ্চয় হয় না। আর এই এক নারী দেহ, বহু ভাবে বহু রকমে দেহটিকে নিয়ে খেপে উঠেছেন তিনি, কিছুতেই পুরনো হয়নি। শুধু রহস্য, অজানা অচেনা জগতে তলিয়ে যাবার মত একটা অদ্ভুত চেতনা, আর তৃপ্তি, এই তিন বস্তু দিয়ে তৈরী

কৃষ্ণার শরীর। করুণাকেতন ঐ দেহ-দেউলে পূজা দিয়েপ্রতিবার নবজীবন লাভ করেন যেন, অসীম তৃপ্তিতে তাঁর ওপর ভেতর পরিপূর্ণ হোয়ে যায়। কিছু একটা পাওয়ার মত পাওয়ার পর যে রকম মেজাজ হয়, সেই রকম মেজাজ নিয়ে সদ্য ঘুম থেকে জেগে উঠলেন যেন তিনি। বসে রইলেন চুপ করে, ভবিষ্যতের চিন্তাটা মনের কোণেও উদয় হোল না।

স্নান করে এল কৃষ্ণাও। নতুন রকমের সাজ-পোশাকে এল। লালপাড় গরদের শাড়ি পরেছে, বগল পর্যন্ত কাটা একটা জামা গায়ে দিয়েছে। ভিজে চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠে। করুণাকেতনের চোখ জুড়িয়ে গেল। একটা কথা বলেই ফেললেন তিনি। বললেন —"ঐ যে একটা ফালতু জঞ্জাল বুকে বাঁধ, ওটা তোমার দরকার হয় না। ওগুলো দূর করে দাও।"

"শুরু হোল আবার আবদার", কৃষ্ণা ঘাড় বেঁকিয়ে তেরছা চোখে শাসিয়ে উঠল—"এবার একটু একটু করে বাড়বে। কাপড় জামা সমস্ত খোল, লাইট ফেলে ফেলে ছবি তুলব। কই সেই ছবিগুলো? বার কর শিগ্‌গির, বার কর। তখনই বলেছিলাম, ওগুলো হারাবে। ওগুলো পরের হাতে পড়ার অর্থ কি জান? আমাকে যারা চেনে তারা যদি পায়, তা'হলে?"

করুণাকেতন বললেন—"তাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবে। ঘটলেও ক্ষতি নেই, কেউ তোমার নাগাল পাবে না। আর খানিক পরেই আমরা পালাচ্ছি। এমন জায়গায় পালাব, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকব যে কেউ পাত্তাই পাবে না।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে কুমকুম লাগাতে লাগাতে কৃষ্ণা বললে—"সে আর ক'দিনের জন্যে। যে ক'দিন না উত্তেজনাটা জুড়োয়। তারপর আবার এই শহর, আবার সেই নিশাসঙ্গিনীদের সঙ্গে বোতল বোতল—"

করুণাকেতন উঠে গেলেন কৃষ্ণার পেছনে। তিনি যেন ভূত দেখতে পেলেন হঠাৎ, কৃষ্ণার ঘাড় থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বার বার দেখতে লাগলেন। আয়নায় তাঁর ছায়া দেখতে পেল কৃষ্ণা, আশা করতে লাগল একটা কোনও অভিনব ধরনের কিছু করবেন করুণাকেতন তার দেহটাকে নিয়ে। অপেক্ষা করতে লাগল সে, তারপর বেশ আশ্চর্য হোয়ে গেল যখন করুণাকেতনের হাত তার দেহটিকে স্পর্শ করল না। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়াল। করুণাকেতন সেই এক ভাবে তার সামনের দিকটাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কৃষ্ণা ঝংকার দিয়ে উঠল—"ও আবার কি হচ্ছে ?"

করুণাকেতন পিছিয়ে গেলেন। যেতে যেতে আর একবার উচ্চারণ করলেন—"স্ট্রেঞ্জ ! অদ্ভুত ! আশ্চর্য !"

তারপর খাওয়াদাওয়া হোল।

খাওয়ার পরে করুণাকেতন বললেন, তিনি একবার বেরবেন। টিকিট কিনতে হবে, আরও দু' একটা কাজ আছে। কৃষ্ণা যেন ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নেয়।

ধুতি পাঞ্জাবি চাদর এবং রাতে পরবার চটি পরে বেরলেন ক্লাব ক্লাসিক থেকে ড্যাট্ সাহেব। একখানা ট্যাক্সি ধরে সোজা উপস্থিত হলেন নামজাদা এক পত্রিকার অফিসে। সেই পত্রিকায় সিনেমা সংক্রান্ত খবরাখবর ছাপে। ভবিষ্যতে যাঁরা সিনেমা আকাশে নক্ষত্র হবার আশা রাখেন তাঁরা সেই পত্রিকা আফিসে গিয়ে ছবি তোলান। সেই ছবি পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্যে পত্রিকাওয়ালাকে মোটা রকম টাকা দেন।

অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন করুণাকেতন যে রুবি মুস্তাফির নানারকমের ফোটো তাঁদের হেপাজতে আছে। তার পায়ের পাতা

থেকে মাথার চুল, সর্বাঙ্গের সব রকম খুঁটিনাটি জানতে পারা যাবে সেই ফোটোগুলো থেকে। থোক দু'শ টাকা বার করলেন তিনি। বললেন, তখনই নাম প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন এমন একজন সিনেমা ডিরেক্টারের কাছ থেকে তিনি আসছেন। ঐ মেয়েটির সব কখানা ফোটো চাই। হয়তো ওকে একটা বিশিষ্ট চরিত্রে মানিয়ে যাবে।

নগদ দু'শ টাকা! ফোটোগুলি তৎক্ষণাৎ হাতবদল হোল। করুণাকেতন স্বনিকেতনে ফিরে এলেন।

কৃষ্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু আলুথালু হোয়ে গেছে তার কাপড়চোপড়। একটা জোরালো বাতি জ্বালিয়ে ফোটোর দেহটির সঙ্গে কৃষ্ণার দেহটি মিলিয়ে দেখতে লাগলেন করুণাকেতন। যতই দেখতে লাগলেন ততই আশ্চর্য হোতে লাগলেন। বার বার ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন—স্ট্রেঞ্জ! স্ট্রেঞ্জ! দুটো মানুষের দেহ এই রকম ভাবে মিলে যেতে পারে!

নিশ্চয়ই পারে।

দিনের আলো ফুটে উঠতে যোগজীবন দেখল সেই জেলেটিকে, যে সেদিন ভোরবেলা হাঁটুসমান জলে দাঁড়িয়ে জাল টানছিল। সেদিন পরে ছিল নোঙরা নেকড়া, মাথায় একখানা ময়লা গামছা জড়ানো ছিল। আজ পরে আছে একখানা খাটো ধুতি আর একটা হাতকাটা কামিজ, তার ওপর জড়িয়েছে একখানা অতি খেলো আলোয়ান। ঐ পোশাকটি ছাড়া সমস্ত এক রকম। সেই অসম্ভব কালো রঙ, সেই হাড়বারকরা চেহারা, সেই অসম্ভব খাড়া নাক। কোনও তফাত নেই। সেদিন জাল টানছিল এক নদীর ধারে হাঁটুসমান জলে দাঁড়িয়ে, আজ আর এক নদীর শুখনো বালির ওপর দিয়ে ঢুলতে ঢুলতে হাঁটছে। বড় সেজ মেজ ছোট

নানা আকারের নানা মাপের নোড়ানুড়িতে বোঝাই নদীটা, জল নেই। হয়তো আছে দু'একটি জলের রেখা, কোথায় আছে খুঁজে বার করতে হবে।

ডান দিকে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে রক্তবর্ণ সূর্য, নোড়ানুড়ি-গুলোকে কেমন যেন রক্তমাখা দেখাচ্ছে। প্রায় নদীর মাঝখানে এসে পড়েছে ওরা, সামনে দেখা যাচ্ছে কালো জঙ্গল। ঐ জঙ্গলে গিয়েই উঠতে হবে বোধ হয়। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, এ সব প্রশ্নের জবাবই বা কে দেয়! কোনও কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করবারও উপায় নেই। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। চোখ মুখ হাত বাঁধা চীনে দুটোকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, নিয়ে চলেছেন তাঁরা দুজন যাঁরা তার দু'পাশে বসে ছিলেন। জেলে ভদ্রলোকটির পাশে বসে যিনি এলেন তিনি চলেছেন আরও খানিকটা এগিয়ে। তাঁর সাজপোশাক জঙ্গী ধরনের, অদ্ভুত জাতের খুব বেঁটে একটা রাইফেল জাতীয় জিনিস তাঁর হাতে ঝুলছে। চলনটাও তাঁর অদ্ভুত, বড় পাথর দেখলেই তার ওপর লাফিয়ে উঠছেন। কি যেন দেখছেন চারিদিকে মুখ ঘুরিয়ে। তারপর লাফিয়ে নেমে আবার হাঁটছেন। তাঁর চলার ধরন, তাঁর সমস্ত চালচলনই কেমন যেন হন্যে জন্তুর মত, শিকার দেখতে পেলেই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

আরও খানিক এগিয়ে যাবার পরে জল দেখা গেল। পায়ের পাতা ডুবতে পারে বড়জোর, এমন জল বয়ে চলেছে। পঁচিশ ত্রিশ হাত জলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। সবায়ের পায়েই জুতো, যোগজীবন পরে আছে চপ্পল, জেলে ভদ্রলোকটির পায়ে কেড্‌স্‌, বাকী সবাই সু পরে আছেন। যোগজীবন চপ্পল হাতে করে জলে নামল, আর কেউ জুতোর জন্যে পরোয়া করলেন না। জলটা যেখান দিয়ে বইছে সেখানে নোড়ানুড়ি কম। জলের তলায় বালি

চিকমিক করছে। কয়েক হাত এগিয়ে যোগজীবন নীচু হোল দু'খাবলা জল মুখে মাথায় দেবার জন্যে। হঠাৎ ক্রৌক্ ক্রৌক্ কড়াৎ। শব্দটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে কে একটা ধাক্কা মারলে তাকে, মুখ থুবড়ে পড়ল সে জলের মধ্যে। ফট্ ফট্ ফট্ ফট্ অনবরত কানফাটানো শব্দ হোতে লাগল খুব কাছেই। মুখ তুলে যে তাকাবে সে উপায় নেই, পিঠের ওপর কে যেন চেপে শুয়ে আছে। কোনওকমে জল থেকে মুখটা উঁচু করে শ্বাস নিতে লাগল।

মিনিটখানেক চলল সেই ফট্ ফট্ শব্দ। তারপর দূরে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হোল। একসঙ্গে একশটা ছুটন্ত লরির টায়ার ফাটল যেন। রাশি রাশি পাথরের টুকরো আর বালির বৃষ্টি হোল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর একদম সব নিস্তব্ধ হোয়ে গেল। যোগজীবনের পিঠের ভারটাও নামল পিঠ থেকে। হাতে পায়ে ভর দিয়ে কোনওরকমে খাড়া করল সে নিজেকে। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। দেখল, জেলে ভদ্রলোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে জলে ভেজা চুরুটটার পানে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। একটু তফাতে একটা চীনে উপুড় হোয়ে পড়ে আছে, তার শরীরের তলা থেকে ফিকে রক্তবর্ণ জল বয়ে চলেছে। আর একটা চীনে বসে আছে তার পাশে, কপালের ওপর চোখবাঁধা কাপড়টা নেই। তার মুখপানে তাকিয়ে শিউরে উঠল যোগজীবন, অমন বীভৎস মুখ আর কখনও সে দেখেনি। লোকটার চোখ দুটো আর নাকটা যেখানে ছিল সেখানটা হাঁ হাঁ করছে। কপালের নীচে থেকে ঠোঁটের ওপর পর্যন্ত সবটুকু খাবলা মেরে কে যেন উঠিয়ে ফেলেছে।

আর তিনজন গেল কোথায়!

চারিদিকে তাকিয়ে আর কাউকে দেখতে পেল না যোগজীবন। পাশে দাঁড়ানো জেলে ভদ্রলোকটিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য হাঁ করল। তিনি একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—"গেল

ভিজে চুরুটটা। শান্তিতে একটা চুরুট আগাগোড়া খাব আশা করেছিলাম। ভোরবেলাই দিলে মেজাজ খিচড়ে। এ রকম জ্বালাতন করলে ক'দিন মানুষ মাথার ঠিক রাখতে পারে!"

ঠিক বুঝতে পারল না যোগজীবন যে প্রশ্নটা তাকেই করা হোল কি না। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সে তাঁর মুখের দিকে। আধপোড়া ভিজে চুরুটটা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে কচকচ করে তিনি চিবতে লাগলেন।

একটু পরে দেখা গেল জঙ্গী পোশাক পরা সেই লোকটি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে। পোশাকটা ভিজেছে, ছিঁড়েও গেছে কয়েক জায়গায়। হাতে তখনও সেই বেঁটে রাইফেলটা ঝুলছে। খুব কাছাকাছি এসে লোকটা উচ্চারণ করল —"অল্ ক্লিয়ার স্যার"

স্যার থু থু করে চিবনো তামাকটা ফেলে দিয়ে বললেন—"ওরা দুজন কই? ওরাও যে গেল তোমার পিছু পিছু।"

লোকটা মুখে কিছু বললে না। ডান হাতখানা উলটে নিজের কপালে ঠেকিয়ে আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর সজোরে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলে।

জেলে ভদ্রলোক আর কিছু সময় নির্বাক হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন চীনেটার দিকে। সযত্নে তাকে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন। দিয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাদের পানে তাকিয়ে। শেষে সেই আধঘুমন্ত এলিয়ে পড়া সুরে বললেন—"চল হে রায়, পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা অনেকটা হবে। ডেরায় না পৌঁছনো পর্যন্ত একটু চাও আমরা পাব না।"

ডেরা।

মস্ত বড় এক চা-বাগানের মধ্যে ছোট একটি টিলার ওপরে অতি সুদৃশ্য সাহেবী ফ্যাশনের বাঙলো। বাঙলোর চতুর্দিকে সযত্নরচিত ফুলবাগিচা। বাঙলোটির ঠিক পেছন থেকে জঙ্গল শুরু হোয়েছে, সেই জঙ্গলই নেমে গেছে নদীর ধার পর্যন্ত। সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উঠতে উঠতেই হঠাৎ দেখা গেল বাঙলোটিকে। বাঙলোটি নজরে পড়তেই সেই জেলে ভদ্রলোক মুখের মধ্যে ডান হাতের দুই আঙুল ঢুকিয়ে খুব জোরে সিটি দিলেন। ওপর থেকে মেঘ-গর্জনের মত শব্দ ভেসে এল। একটু পরে আবার সেই শব্দ শোনা গেল খুব কাছে, তখন বুঝতে পারল যোগজীবন যে রাক্ষুসে দুটো কুকুর ডাকছে। তারপর দেখা গেল তাদের, হুড়মুড় করে তারা নেমে এল। প্রকাণ্ড আকারের খাসির মত তাদের বপু, অতি বদখত থ্যাবড়া মুখ, গায়ে লোম নেই বললেই হয়। ছুটে নেমে এসে রোগা লোকটির বুকের ওপর দুজনের চারটে থাবা তুলে তাঁর মুখের ওপর তারা মুখ ঘষতে লাগল। কৃতার্থ হোয়ে পড়লেন যেন তিনি। বললেন—"হোয়েছে হোয়েছে, চল এখন। আগে আমরা চা খাব তারপর অন্য কথা।" কুকুর দুটো যেন বুঝতে পারল তাঁর কথা, বুক থেকে থাবা নামিয়ে মাটির ওপর পড়ল তারা, পড়েই ফিরে দৌড়। অসম্ভব খাড়াই ভেঙ্গে ঐ রকমের বপু নিয়ে চক্ষের নিমেষে তারা উঠে গেল। ওপর থেকে আবার আওয়াজ ভেসে এল—ভৌ ভৌ ভৌ। জেলে ভদ্রলোক খুশী হোয়ে উঠলেন। বললেন—"যাক, যশোদা তা' হলে চায়ের জল চাপিয়ে দেবে।" আরও কয়েক মিনিট চড়াই ভাঙবার পরে ফুলবাগানে এসে পৌছন গেল। দেখা গেল সেই জঙ্গী পুরুষটি সেখানে খাড়া রয়েছে। আর একবার উচ্চারণ করল সে—"অল্ ক্লিয়ার স্যার—সব ঠিক হ্যায়।"

স্যার বললেন—“বেশ। এখন আরাম করগে। আর পাণ্ডা যদি ফিরে থাকে, পাঠিয়ে দাওগে।”

গোড়ালির সঙ্গে গোড়ালির ঠোকাঠুকি লাগিয়ে হাতটা কপালে ছোঁয়ালে লোকটি। তারপর ফুলবাগিচার ভেতর দিয়ে হনহন করে চলে গেল। যোগজীবন নজর করে দেখলে যে তার হাতে তখন সেই বেঁটে অস্ত্রটা নেই।

হঠাৎ ঝুমুরের আওয়াজ কানে গেল। ঝুম ঝুম আওয়াজ তুলে কে যেন এগিয়ে আসছে। হকচকিয়ে গেল যোগজীবন, সাহেবী বাঙলোয় ঝুমুর পায়ে বেঁধে হাটছে কে!

স্যার ডাক দিলেন—“যশোদা, এধারে আয়। দেখে যা কাকে সঙ্গে এনেছি।”

খুব কাছ থেকে যশোদা বিচিত্র সুরে সাড়া দিলে। কোনও জংলী পাখী যেন কুক্ দিয়ে উঠল। স্যারের পিছু পিছু বাঙলোর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল যোগজীবন। উঠে নজরে পড়ল একটি আশ্চর্য জীব, বিচিত্রবেশিনী যশোদা ঠিক সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে।

মাথা থেকে চরণ, ছোটখাট দেহটিতে ভাগে ভাগে জড়ানো হয়েছে খণ্ড খণ্ড কাপড়ের টুকরো, প্রতিটি টুকরোর রঙ আলাদা। মাথায় জড়িয়েছে সোনালী রঙের এক রুমাল, গলায় জড়িয়েছে আসমানী রঙের খুব পাতলা এক টুকরো কাপড়। অতি সংক্ষিপ্ত এক জামা পরে আছে যার রঙ ঘোর বাদামী। জামা যেখানে শেষ হোয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে অতি মসৃণ খানিকটা সাদা চামড়া। তারপর পায়ের গোছ পর্যন্ত নেমে গেছে এক ঘাগরা। ঘাগরার রঙ কচি কলাপাতার মত। সেই ঘাগরা যেখানে শুরু হোয়েছে

সেখানে পেঁচানো হোয়েছে ভয়ংকর লাল এক টুকরো কাপড়, সেটা কোমরবন্ধের কাজ করছে। ঐ অসামান্য সাজে সজ্জিত শরীরে গয়না আছে একরাশ। দু'হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত ভারী ভারী পেতলের গয়না, দুই কানে চেনসুদ্ধ বড় বড় দুই রুপোর ফুল, দুই পায়ের গোছে বাঁধা হোয়েছে রাশীকৃত ঘুঙুর। সত্যিই সঙ, ঠোঁটে গালে রঙ, দুই চোখে অস্বাভাবিক লম্বা করে কাজল টানা হোয়েছে, কপালে নানারকম অলকাতিলকা তো আছেই। সত্যিই সঙ্, সেই অদ্ভুত সঙ্ দেখে মানুষ না হেসে পারে না।

অতগুলো সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে একের পর এক, কোনও রকমে ধড়ে প্রাণটা নিয়ে একটা আশ্রয়ে এসে পৌছতেই ঐ সঙ্। যোগজীবন না হেসে থাকতে পারল না।

যিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন, তিনি বললেন—"হেস না রায়, খবরদার হেস না। হাসলে যশোদার মাথায় খুন চেপে যাবে। মেয়ে আমার নাচ শিখছে, নাচ শেখা ব্যাপারটা হালকা ব্যাপার নয়। এ নাচটা কোথাকার নাচ রে যশোদা? কোন্ দেশের নাচ শিখতে হলে এই রকম সাজতে হয়?"

গম্ভীর কণ্ঠে মেয়ে জবাব দিল—"উপজাতীয় নৃত্য, উত্তর পূর্ব ভারতের আদিম অধিবাসীরা এই রকম সাজপোশাক পরে নাচে।"

শুধু নাচ নয়, মেয়েটি আরও বহু জাতের বিদ্যে জানে। মেয়ের ওপর ভার দিলেন বাপ একটি বিদ্যে যোগজীবনকে শেখাবার জন্যে। বললেন—"রাইফেল পিস্তল কেমন করে চালাতে হয়, ওকে শিখিয়ে দিবি তুই যশোদা। জিনিসগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও আড়ষ্টতা ভাঙবে। আজকালকার দিনে অস্ত্রশস্ত্র চালাতে

না জানা একটা অপরাধ। শিখে রাখা ভাল, বলা যায় না কখন কোন্‌টে কাজে লাগে।”

“কিন্তু কটা লোক অস্ত্রশস্ত্র হাতে পাচ্ছে, ওসব জিনিস চোখেই দেখে না কেউ,” অসাবধানে ছিল বলেই বোধ হয় ঐ মন্তব্যটুকু প্রকাশ করে ফেলল যোগজীবন। কথাটা মুখ থেকে বেরবার পরেই আড়ষ্ট হোয়ে পড়ল, সভয়ে একবার তাকাল ওঁদের দুজনের মুখপানে। না, ওঁরা মোটে খেয়ালই করেননি। মেয়ে বাপ দুজনেই মাথা গুঁজে খেয়ে চলেছেন। যোগজীবন আবার তার প্লেটের ওপর নুয়ে পড়ল।

প্রায় মিনিট্ পাঁচেক পরে খাওয়ার পাট একদম চুকিয়ে বাপ বললেন—“তা’ হলে ঐটুকুই তুমি মনে রেখ। এই দেশের ছেলে মেয়ের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিতে হবে, দেশের ছেলে মেয়েরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আত্মরক্ষা করতে শিখবে, শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করবার অধিকার দিতে হবে এ দেশের প্রতিটি সন্তানকে, এই হোল তোমার মত। খুবই বড় কথা। এখন নিজের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া কর। তোমার ঐ মতটিকে কাজে পরিণত করবার জন্যে কতদূর পর্যন্ত তুমি এগতে পার, ভেবে দেখ। আর এখানে যে ক’দিন আছ, রাইফেল পিস্তল নিয়ে নাড়াচাড়া কর। যশোদা সব দেখিয়ে দেবে তোমাকে, রাইফেল চালানো প্রতিযোগিতায় প্রথম হোয়ে মেয়ে আমার প্রাইজ পেয়েছে।”

মেয়ে বলল—“এক দিনেই সব শিখে যাবেন, কিন্তু চালানোটা অভ্যাস করা চাই। হরদম চালাতে হবে, চালাতে চালাতে নিশানা ঠিক হবে। প্রথম প্রথম চমকে উঠবেন, হাত কেঁপে যাবে। তারপর সব ঠিক হোয়ে যাবে। কিন্তু এখানে রাইফেল শেখার সুবিধা হবে কি! কয়েকবার ফায়ার করলেই চারিদিক থেকে লোকজন ছুটে আসবে।’

বাপ বললেন—"ঠিক বলেছিস। আসামে গিয়ে যত খুশি ফায়ার করবে রায়, এখন শুধু ওগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করুক। কলকবজাগুলো কোন্‌টে কি কাজ করে জেনে নিক। খুলতে শিখুক জুড়তে শিখুক, দু'চারবার ফায়ার করেও দেখুক। ফায়ার করলে একটা ধাক্কা লাগে, সেই ধাক্কাটার সঙ্গে পরিচয় হোক। আচ্ছা, এখন শুয়ে পড়গে, সারারাত ঘুমতে পাওনি। আমিও যাই, একটু গড়িয়ে নি। সন্ধ্যের পরে আবার দেখা হবে।"

বলতে বলতে টেবিল ছেড়ে উঠে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে, আর কিছু বলার দরকার আছে বলেও মনে করলেন না। দরকার সত্যি ছিলও না আর কিছু বলার, তারপর মেয়েই যোগজীবনের ভার নিলে। বললে—"সত্যি আপনি ঘুমতে শোবেন নাকি এখন ?"

যোগজীবন বলল—"দশ দিন না ঘুমলেও দিনে আমি ঘুমতে পারব না।"

যশোদা বলল—"ঠিক, দিনে ঘুময় যাদের ভুঁড়ি আছে। ভুঁড়ো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। চলুন, বাইরে বসে গল্প করা যাক। দুপুরবেলা ঘরের মধ্যে বসে থেকে লাভ কি, বাগানে গাছতলায় বসব—কেমন ?"

'কেমন' কথাটি উচ্চারণ করল এমন চমৎকার ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে যে যোগজীবন বোবা হয়ে গেল। আশ্চর্য, অমন মিষ্টি করে মানুষ কথা বলতে পারে!

মিষ্টি কথা শোনার একটা নেশা আছে। নেশাটা চড়ে গেলে মিষ্টি কথা শুনতে শুনতে পেটের কথা একটি দুটি করে বেরিয়ে যায়। ওধারে সময় যে কখন কি ভাবে পালায় তা' মোটে বোঝাই যায়

না। দুপুর পালিয়ে গেছে অনেকক্ষণ বিকেলও পালাই পালাই করছে, যোগজীবন তখনও গাছতলায় বসে মিষ্টি কথা শুনছে। যা শুনছে তার বহুগুণ বেশী নিজে বলছে। বলছে নিজের দুঃখের কাহিনী। বহুকষ্টে একটা চাকরি জুটিয়েছিল, মনিবের মত মনিবও জুটেছিল, সব গেল। চাকরি গেছে, প্রাণটাও বোধ হয় যাবে। চাকরি ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হোল সে, কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে। বিপদ তার সঙ্গ নিয়েছে। তাকে খুন করবার জন্যে তার সঙ্গে লোক আসছে। দুটো চীনে সঙ্গ নিয়েছিল তার, তাদের সঙ্গে ছোরা পিস্তল ছিল। চীনে দুটো অবশ্য সাবাড় হোয়েছে, কিন্তু ঐ জাতকে বিশ্বাস নেই। দুটো মরেছে, আরও দশ বিশটা হয়তো মুখিয়ে উঠেছে। সুতরাং কতক্ষণ যে সে বেঁচে আছে তারই কোনও ঠিক নেই, হঠাৎ হয়তো কেউ আড়াল থেকে গুলি করে বসতে পারে।

ঘাড় হেঁট করে বসে ঘাসের ডগা ছিঁড়ছিল যশোদা আর একমনে শুনছিল। হঠাৎ বলে বসল—"অদ্ভুত মজা তো!"

আশ্চর্য হোয়ে জিজ্ঞাসা করল যোগজীবন—"মজা! কি মজা!"

"এই আপনার মত বেঁচে থাকা"—উত্তেজিত হোয়ে উঠল যশোদা। মাথা ঘুরিয়ে চারিদিক দেখে নিয়ে বললে—"ভাবতেই আমার কেমন লাগছে। সদাসর্বক্ষণ আমায় খুন করার জন্যে আমার পেছনে লোক লেগে রয়েছে, এই রকম অবস্থায় খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমচ্ছি, কোনও পরোয়া নেই। আশ্চর্য মানুষ আপনি, সত্যি আপনি সাংঘাতিক মানুষ। কিছুতেই আমি আপনার কাছছাড়া হব না। আপনার সঙ্গে থাকলে ঐ কথাটা ভুলতে পারা যাবে না যে হয়তো কেউ কোথাও থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর, যে কোনও মুহূর্তে একটা গুলি লাগতে পারে মাথায়।

আমার হিংসা হচ্ছে, আপনার মত আমার কপালটা যদি হোত।"

যোগজীবন বোবা হোয়ে গেল। বুঝতে পারলে যে অকপটে তার মনের বাসনাটা জানাচ্ছে যশোদা। ঠাট্টা করছে না বা ভেংচাচ্ছে না, সত্যিই সে মনে করে যে সদাসর্বক্ষণ কেউ না কেউ খুন করার জন্যে লেগে রয়েছে সঙ্গে, এই অবস্থায় বেঁচে থাকার নাম বাঁচার মত বাঁচা। অদ্ভুত শখ, কিন্তু শখটির মধ্যে এতটুকু ভেজাল নেই।

কি যেন খানিক ভেবে নিলে যশোদা, নিয়ে বলল—"কিন্তু চীনেগুলো লাগল কেন আপনার পেছনে?"

যোগজীবন বলল—"ভগবান জানেন। কস্মিনকালে কোনও লোকের সঙ্গে আমি লাগতে যাই না, কেউ বলতে পারবে না যে একটি লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। যদি কেউ চড়া কথা বলে আমি ঘাড় হেঁট করে থাকি। আমার মত নির্বিরোধী মানুষ আর একটা আপনি খুঁজে পাবেন না। ভাগ্য দেখুন, আমাকে খুন করবার জন্যেও লোকে ক্ষেপে ওঠে।"

চোখ দুটো বড় বড় করে যশোদা ওর মুখপানে তাকিয়ে রইল। একটু পরে ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল—"ঠিকই বলেছে বাবা, ঠিকই বলেছে।"

যোগজীবন জিজ্ঞাসা করল—"কি বলেছেন তিনি?"

যশোদা বলল—"সাংঘাতিক মানুষ আপনি। সাক্ষাৎ যমের সামনে দাঁড়িয়েও আপনার ঐ ভালমানুষী ভাবটি বজায় থাকে। মরণ যে কি ব্যাপার তা' যেন আপনি জানেনই না। সত্যিই আপনার মত ইস্পাতে গড়া মানুষ দুনিয়ায় আর একটি নেই।"

মানুষ নয় মেয়েমানুষ, ইস্পাতে গড়া মেয়েমানুষ। চোখ বুজে শুয়ে ভাবছেন করুণাকেতন, যে নারীদেহটি ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে আছে তাঁর পাশে, ওটির অন্তর বিশুদ্ধ ইস্পাত দিয়ে গড়া। কি ভয়ংকর সাহস আর কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে তবে মানুষ ঐ রকম ভাবে ঠকাবার কথা কল্পনা করতে পারে। দিব্যি চলে এল রুবি মুস্তাফি সেজে, একটি বারের জন্যেও ভাবল না যে ধরা পড়ে যেতে পারে। বেশী কিছু অদলবদলও করেনি নিজের চেহারার, একটু বেশী পরিমাণে রঙ মেখেছিল, ঠোঁট দুখানা একটু বেশী লাল করে ফেলেছিল আর কাজল টেনে চোখ দুটোকে খানিক বাড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর ছিল সেই রুবির আংটিটা, মুস্তাফির আঙুলে ঐ ধরনের আংটি সর্বক্ষণের জন্যে আছে। তাই ওটা পরে এসেছিল। দিনের আলোয় চার হাত সামনে বসে ধীরে সুস্থে অতগুলো টাকা ঠকিয়ে নিয়ে এল, তিনি ধরতে পারলেন না। পাকা ধড়িবাজ না হোলে কেউ ও কর্ম পারে!

সব চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হচ্ছে, ইস্পাতে গড়া অন্তর এই ধড়িবাজ মেয়েমানুষটি যে কোনও উপায়ে হোক জেনে ফেলেছে তাঁর কাজকারবার। যোগজীবনকে তিনি কি কাজে লাগিয়েছিলেন, তাও ভাল করে জানে, যোগজীবনকেও ভাল করে চেনে। যোগজীবনকে যে ও চেনে, এ কথাটা এতদিন জানতেও পারেননি করুণাকেতন। যোগজীবন মরেছে, এ খবরটাও এই মেয়েমানুষটি রাখে। তার নাক কান কেটে নেওয়া হোয়েছে, আরও কত কি অত্যাচার হোয়েছে হতভাগাটার ওপর, সমস্ত সংবাদ এ পেয়েছে। কি করে পেল!

জিজ্ঞাসা করবারও উপায় নেই। কিছুতেই করুণাকেতন কৃষ্ণাকে জানতে দেবেন না যে তিনি ধরে ফেলেছেন তার চালাকি। রুবি মুস্তাফি সেজে দশ হাজার টাকা ঠকিয়ে এনেছে সে, এ সম্বন্ধে

তিনি নিজে নিঃসন্দেহ। কিন্তু ঐটুকুই কৃষ্ণাকে জানাবেন না। দেখাই যাক না, আরও কি চাল চালে।

আসবার আগে সামান্যক্ষণের জন্যে তিনি রুবির হোটেলেও গিয়েছিলেন। রুবি ছিল না, হোটেলের ম্যানেজার ছিল। সে লোকটা হায় হায় করতে লাগল। তাদের হোটেল থেকে রুবি চলে যাচ্ছে। কারণ সে যখন তার ঘরে ছিল না তখন কে নাকি তার ঘরের তালা খুলে ঢুকে তার জিনিষপত্র সব ঘাঁটকে দেখেছে। কিছু নিয়েছে কিনা তা রুবি জানায়নি। ভয়ানক রকম চটে গেছে সে, সেই দিনই সেই হোটেল ত্যাগ করবার জন্য অন্য হোটেল খুঁজতে বেরিয়েছে।

ম্যানেজারবাবুটি বললেন—"কাক মশাই কাক। মেয়েমানুষ আর কাকে কোনও ফরক নেই। আজকাল ঐ বিনিসুতোর শাড়ি পরলে আর ঐ পেটবারকরা জামা গায়ে দিলে আর মুখে খানিক রঙ মাখলে সব মেয়েমানুষই একরকম দেখতে হোয়ে যায়। এক পাল কাকের ভেতর থেকে একটা কাক আলাদা করে চিনে রাখুন তো দেখি কেমন আপনার ক্ষমতা। এও সেই রকম। হাঁ, আমরা মানছি, সন্ধ্যেবেলা ঢুকেছিল একটা মেয়েমানুষ ওঁর ঘরে। ওঁর নিজস্ব চাকর অথব বুড়ো মানুষ, তাকে ভাঁওতা দিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু করব কি বলুন আমরা, দিনরাত সবকখানা ঘরের সামনে একটা করে দরোয়ান বসিয়ে রাখা তো সম্ভব নয়। আর দরোয়ান রাখলেই বা লাভ কি হোত শুনি। দরোয়ানকেও সেই মেয়েমানুষটা ঐভাবে ভাঁওতা দিত। মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিয়ে আসল নকল যাচাই করা কি সম্ভব—আপনিই বলুন।"

তা সম্ভব নয়, মনে মনে মেনে নিয়ে চলে এসেছিলেন করুণাকেতন। জেনে এসেছিলেন যে রুবির ঘরেও গিয়ে ঢুকেছিল কৃষ্ণা। বোধ হয় রুবির কাপড় জামা এনেছিল। সেগুলো গায়ে

চাপিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গিয়ে আবার ফেরত দিয়ে এল। সমস্তই সম্ভব, যে মেয়ের ভেতরটা খাঁটি ইস্পাত দিয়ে বানানো তার পক্ষে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই।

অসম্ভব জীবটি তাঁর পাশে শুয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে ঘুমচ্ছে। যদি জানতে পারে যে তিনি ওর ধরিবাজি ধরে ফেলেছেন তা'হলে কি হবে। লাভ হবে না কিছুই, শুধু আরও কতকগুলো টাকা জলে যাবে। অনেকগুলো টাকা গুনে দিয়ে হাওয়াই জাহাজের টিকিট কিনে উড়ে এসেছেন তিনি ওকে সঙ্গে নিয়ে। পাহাড়ের ঠাণ্ডায় শরীর মন জুড়িয়ে যাবে এই আশায় এসেছেন। সে আশায় ছাই পড়বে। যদি জানতে পারে কৃষ্ণা যে তার সেই চালাকিটা তিনি জানেন, তা'হলে আর এক মুহূর্তও তিষ্ঠবে না। যে কোনও উপায়ে হোক, পরের প্লেনেই উড়বে। না, অমন বোকামিটা নিশ্চয়ই তিনি করতে যাবেন না।

ব্যাপারটা ভাবতে গিয়েই করুণাকেতন কেমন যেন অসহায় বোধ করলেন। কৃষ্ণা চলে গেছে তাঁকে একলা ফেলে রেখে, এই চিন্তাটাই তাঁকে বেশ মুষড়ে ফেললে। ঠকাক সে যত পারে, আরও কয়েক হাজার টাকা যদি চায় তো খুশী মনে তিনি দিয়ে দেবেন। টাকার জন্যে তিনি মাথা ঘামান না। কিন্তু আর তাঁর একলা থাকবার সাহস নেই। মুখে রবারের বল পুরে দিয়ে মুখ হাত পা বেঁধে তাঁকে উলঙ্গ করে রেখে গেছে যারা, তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টিরা হয়তো আবার এসে চড়াও হবে। না, একলা একটা ঘরে শুয়ে ঘুমনো আর সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। একজন কেউ পাশে থাকা চাই। একজন কেউ! কে সেই একজন!

দল বেঁধে এক পাল নারী তাঁর নিমীলিত চোখ দুটোর সামনে উপস্থিত হোল। একে একে কমতে লাগল তারা দল থেকে। তাদের চোখ মুখ সর্বদেহ মানসনেত্রে তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে

নিলেন। ফল হোল এই যে হঠাৎ তাঁর পেটের ভেতর কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। এক ঝলক থুথু উঠে এল তাঁর মুখের মধ্যে, প্রায় বমি করার মত অবস্থা। সামলে উঠলেন সে ভাবটা কোনওমতে, তারপর কৃষ্ণার শরীরের ওপর আলতো ভাবে একখানি হাত রেখে পাশ ফিরে শুলেন। রহস্যময় একটা গন্ধ পেলেন শ্বাসের সঙ্গে। ঐ গন্ধটা কৃষ্ণা ব্যবহার করে। ভয়ানক দামী সেণ্ট, বম্বেতে এক নামকরা পার্শীর দোকানে পাওয়া যায়। অন্যত্র নাকি জিনিসটা মেলেই না।

সেই সেণ্টের গন্ধেই বোধ হয় একটু একটু করে তাঁর তন্দ্রাভাব আসতে লাগল। ঘুমতে পারলেন না, ঘুমিয়ে পড়া আর বোধ হয় সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে, তন্দ্রার মাঝখানেই কেমন যেন একটা ধাক্কা খান ভেতর থেকে। চমকে ওঠেন, তারপর তন্দ্রাটুকুও কেটে যায়।

তবু স্থির হোয়ে পড়ে রইলেন সেই আধ-ঘুমন্ত আধজাগ্রত অবস্থায়। একটু পরে বুঝতে পারলেন যে তাঁর হাতের নীচে থেকে কৃষ্ণা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। পাশাপাশি তুখানি নেয়ারের খাটিয়ার ওপর তুজনের শয্যা। নিজের খাটিয়াখানির একেবারে এ প্রান্তে সরে এসে কৃষ্ণার গায়ের ওপর হাত রেখেছিলেন তিনি, হাতখানি নামল আস্তে আস্তে তুখানি খাটিয়ার পাড়ের ওপর। করুণাকেতন এক চুল নড়লেন না। দামী কম্বলে ঢাকা আছে গলা পর্যন্ত, মুখ মাথা শুধু বাইরে রয়েছে। চোখ বুজেও তিনি বুঝতে পারলেন যে কৃষ্ণার মুখ তাঁর প্রায় গালের ওপর এসে পড়ল। একটুখানি নিশ্বাস লাগল তাঁর গালে, আরও মিনিট তু'য়েক রইলেন তিনি সেই ভাবে, তারপর একটিবার চোখ মেলে দেখলেন। ঘর অন্ধকার, তবু বেশ বোঝা গেল কৃষ্ণার আঁধার মূর্তি তার খাটিয়ার ওপাশে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর সেই মূর্তি নিঃশব্দে চলে বেড়াতে লাগল ঘরময়। খাটিয়া দুখানি ছাড়াও ঘরে আরও কয়েকটা জিনিস ছিল। টেবিল চেয়ার দেরাজ আলনা—কোনও কিছুর সঙ্গে সেই মূর্তির ধাক্কা লাগল না। যেন অশরীরী, যেন শুধু ছায়া দিয়ে গড়া। দু'চোখ সম্পূর্ণ মেলে তাকিয়ে রইলেন করুণাকেতন, মতলবটা মোটেই ধরতে পারলেন না।

অসংখ্যবার প্রদক্ষিণ করা হোল খাটিয়া দুখানাকে, ফলে বোধ হয় পা দুখানাকে জিরতে দেবার দরকার হোয়ে পড়ল। করুণাকেতন দেখলেন, একখানা চেয়ারের ওপর নিঃশব্দে বসে পড়ল কৃষ্ণা। তখন তিনি কথা বললেন। বললেন—"আর কেন, সকালের বেড়ানোটা রাতেই সেরে রাখলে, বেশ হোল। এখন এসে শুয়ে পড়। বেলা ন টা পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে ঘুমনো যাবে।"

উঠে পড়ল কৃষ্ণা, দেওয়ালের কাছে গিয়ে আলো জ্বেলে দিলে। খাটিয়ার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—"ঘুমতে পারনি তা'হলে এখনও, আমি মনে করলাম—"

করুণাকেতন বললেন—"লোকটা ঘুমিয়ে বেহুঁস হোয়ে পড়েছে। ওটা তোমার স্বভাব কৃষ্ণা, লোকটা যে সহজে বেহুঁশ হোয়ে পড়ে, এটা তুমি একরকম বিশ্বাস করেই বসে আছ। মানুষকে বোকা বেহুঁস ভাবা তোমার স্বভাব। ঐ স্বভাবটি আছে বলেই তুমি বেপরোয়া।"

"বেপরোয়া!" সরে এসে বসল কৃষ্ণা করুণাকেতনের খাটিয়ার কিনারায়। চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কবে কোথায় বেপরোয়া ভাবে চলতে দেখেছ আমাকে? প্রমাণ করতে পার যে তুমি ছাড়া অন্য এক প্রাণীর সঙ্গে আমি মিশি? যতদিন না তুমি ডাক দাও, ঘর থেকে এক পা বেরোই না, কারও সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাকুক, কখনও কাউকে চিঠিপত্রও লিখি না। দাও,

প্রমাণ দাও, কবে কোথায় আমাকে বেপরোয়া ভাবে চলতে দেখেছ।”

করুণাকেতন উঠে বসলেন, পাশের খাটিয়া থেকে কম্বলখানা টেনে নিয়ে যত্ন করে ঘিরে দিলেন কৃষ্ণাকে। তারপর প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললেন—“এটা পাহাড়, সামনেই বরফঢাকা চুড়োগুলো দেখা যাচ্ছে, এরকম জায়গায় কিছু না জড়িয়ে সারারাত পায়চারি করতে তোমার মত বেপরোয়াতেই পারে। একবার যদি ধরে ঠাণ্ডা, তা’হলে মজা দেখিয়ে ছাড়বে।”

“কথা ঘুরচ্ছ কেন কেতন?” তেরছা চোখে ফোঁস করে উঠল কৃষ্ণা—“বল, বলতেই হবে তোমাকে। সন্দেহ হোয়েছে তোমার, সেই সন্দেহটা কি, তাই জানতে চাই।”

করুণাকেতন বালিশের নীচে থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটি ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—“তুমি জান কৃষ্ণা, সতীত্ব ফতীত্ব ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। ওই ব্যাপারটার মারাত্মক একটা দোষ আছে, ওটা নিজের বেলাও ফলাতে হয়। আমি যদি দাবি করি যে একটি মেয়ে কেবল আমার জন্যেই সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হোয়ে থাকবে তা’হলে ফ্যাসাদে পড়ে যাব। তার কারণ আমি কারও দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হোতে রাজী নই। যেমন কখনও আমি কাউকে নেমন্তন্ন করি না। নেমন্তন্ন করলে সে যদি আমার নেমন্তন্ন রাখে তা’হলে একটা অলিখিত আইনে আমি বাঁধা পড়ে যাব। সেটি হোল, সে যখন নেমন্তন্ন করবে তখন আমাকে যেতে হবে। যেহেতু সে এসেছিল সেহেতু আমারও যাওয়া চাই। না যাওয়াটা অপরাধ। এই অপরাধটা করতে চাই না বলেই—”

কৃষ্ণা কথাটা শেষ করে দিলে—“চমৎকার উড়ো পাখীর জীবন যাপন করছি।”

করুণাকেতন বললেন—"ঠিক। পয়সা রোজগার করছি, খাটছি, খাচ্ছি, বেঁচে আছি। সেধে গলায় বকলস আঁটতে যাই কেন। তোমার পয়সা আছে, পয়সা রোজগারের জন্যে কখনও কোনও কাজ তোমাকে করতে হবে না, সে ব্যবস্থা তোমার ঠাকুর্দা মশাই করে গেছেন। নিজের গাঁট থেকে পয়সা খরচা করে যেমন ভাবে বেঁচে থাকতে মর্জি হয়, বাঁচতে পার তুমি। তা' নিয়ে মাথা গরম করবার অধিকার আমার নেই। আমি ভাবছি অন্য কথা, আমি ভাবছিলাম যে যদি তোমার কখনও টাকা পয়সার দরকার পড়ে, তা'হলে যাতে তুমি হাতের কাছে টাকা পাও, এই জন্যে তোমার নামে ব্যাঙ্কে কিছু রেখে দিলে কেমন হয়। কথাটা তোমায় বলাও যায় না, এখনই তুমি ফোঁস করে উঠবে। তুমি আমার চেয়ে অনেক বড়লোক, ইচ্ছে করলে টাকা দিয়ে আমাকে কিনতে পার। কিন্তু—"

অনেকবার ঠেকতে ঠেকতে খুবই অগোছালো ভাবে ঐ পর্যন্ত বলে থামতে বাধ্য হোলেন করুণাকেতন, থেমে চোখ বুজে ঘনঘন টান দিতে লাগলেন সিগারেটে, কৃষ্ণার পানে চোখ মেলে তাকাতেও সাহস করলেন না।

"কত টাকা জমা রাখবে তুমি কেতন?" খুবই ভালমানুষী গলায় কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল।

চোখ মেলে করুণাকেতন বললেন—"কত আর, এই ধর দশ হাজার বা বিশ হাজার। টাকাটা তোমার নামেই রইল, দরকার পড়ল তুমি খরচা করলে। তা' ছাড়া টাকা আমি হাতে রাখতে পারি না, খরচা করে ফেলি। দুর্দিনে আমারও কাজে লাগতে পারে। কিছু টাকা তোমার কাছে রেখে দিলে সেটা আর কেউ ঠকিয়ে নিতে পারবে না।"

"ঠকিয়ে নেবে!" কৃষ্ণার সুর অতিরিক্ত রকম বাঁকা শোনালো—"তোমাকেও মানুষ ঠকাতে পারে!"

"পারে না।" সিগারেটের শেষটুকু দু'আঙুলে টিপে নিভিয়ে ফেলে দিলেন করুণাকেতন। খুবই বিরক্তির সঙ্গে বলতে লাগলেন—"চোর জোচ্চোরদের অসাধ্য কর্ম আছে। ধর, তোমার মত সেজে ঠিক তোমার মত চেহারা বানিয়ে কেউ এল। এসে বললে, দাও এত টাকা। তখন কি করব আমি? টাকা না দিয়ে যাব কোথায়?"

"আমার মত সেজে আসবে!" এতক্ষণ পরে কৃষ্ণার চড়া সুরে ভাঁটার টান পড়ল। বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়ে গেল যেন। বললে—"এলেই হোল—তুমি ধরতে পারবে না?"

"ধরে লাভ হবে কি লোকসান হবে সেটা আগে বিবেচনা করা দরকার।" করুণাকেতন এতক্ষণ পরে সোজা হোয়ে বসলেন। তাঁর চোখে মুখে চোয়ালে গলার স্বরে উজানের টান এসে গেছে। বললেন—"যে আসবে তোমার মত চেহারা বানিয়ে সে আর একটু কষ্ট করে এমন কতকগুলো কথা জেনে আসবে আমার সম্বন্ধে, যা শুধু তুমিই জান। সেই কথাগুলো আওড়ে বলবে—হয় আমার মুখ বন্ধ কর টাকা দিয়ে নয়ত এই চললাম যথাস্থানে। বাধ্য হোয়ে টাকা বার করে দিতে হবে!"

"সে কথাগুলো কি?" ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করল কৃষ্ণা।

করুণাকেতন প্রায় অট্টহাস্য করে উঠলেন, বললেন—"ঐ যে বললুম, যা শুধু তুমিই জান আর আমিই জানি।"

তারপর সত্যিই জানাজানি হোয়ে গেল। সাহায্য করল নিশীথ রাত্রি, বরফছোঁয়া হাওয়ার শাসানি, আর হিমালয়ের নিস্তরঙ্গ

নিস্তব্ধতা। প্যাশন কথাটার সোজা অর্থ বোধ হয় যন্ত্রণা ভোগ, ওরা দুজনে সেই যন্ত্রণাভোগের হাত থেকে নিস্তার পেলে দুজনের কাছে দুজনের মন উন্মুক্ত উজাড় করে দিয়ে। কৃষ্ণা বলল যে সত্যিই সে কিছু জানে না। হঠাৎ তার ওপর এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়ল। দায়িত্বটা হোল, যে কোনও উপায়ে হোক করুণাকেতনকে বাঁচাতে হবে। কে সেই দায়িত্ব দিল তা' কৃষ্ণা প্রাণ গেলেও বলবে না, বলতে পারবে না। যেই দিয়ে থাকুক, সে সমস্ত জানে। করুণাকেতন কি উপায়ে রাশি রাশি টাকা উপার্জন করেন তা' সে জানে। কৃষ্ণা তার কথা বিশ্বাস করেনি। তখন সে বলল যে ইচ্ছে করলে কৃষ্ণা প্রমাণ নিতে পারে। যখন ইচ্ছে করুণাকেতনের কাছে বলতে পারে যে যোগজীবন রায়কে দিয়ে কি কর্ম করায় করুণাকেতন তা' সে জানে। কাদের পেছনে লাগিয়েছে যোগজীবনকে তাও জানে। ঐটুকু বললেই করুণাকেতন জব্দ হোয়ে যাবে।

বাকীটুকু সমস্তই কৃষ্ণার চালাকি। রুবি মুস্তাফিকে সে চেনে, বহুবার রুবির সঙ্গে করুণাকেতনকে ঢলাঢলি করতে দেখেছে। রুবির শরীরের সঙ্গে তার শরীরের অনেক জায়গায় মিলও আছে। তাই সে ভাবল আর এক হাত উপরচাল দিলে কেমন হয়। ধরা দিতে যাবে কেন সে, রুবি মুস্তাফি মরুক না, তার কি। কৃষ্ণা কৃষ্ণাই থাকবে। কিছুই জানে না কৃষ্ণা, কোনও পেঁচালো পর্বে কৃষ্ণা নেই। ঐ মতলব করে রুবি মুস্তাফি সেজে গিয়েছিল। ঐ টাকাটাও নিয়েছে উপরচালাকি মেরে। টাকাটা ব্যাগে ভরে সঙ্গে এনেছে। ইচ্ছে ছিল, এক ফাঁকে করুণাকেতনের ব্যাগে চালান করে দেবে। পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল, নগদ দশ হাজার টাকা গুনে দিয়ে করুণাকেতন রুবির মুখ বন্ধ করতে চান কি না।

হাঁ করে শুনছিলেন করুণাকেতন। জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু

যখন তুমি বেরলে লিফ্‌ট্‌ থেকে, তখন টাকার প্যাকেটটা তোমার হাতে ছিল না। কার কাছে পাচার করেছিলে সেটাকে ?"

কৃষ্ণা বলল—"আমার ড্রাইভারকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলাম তোমার আফিসের সামনে। তাকে বলেছিলাম যে একটা জিনিস নিয়ে বেরতে পারি আমি। সেটা নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে, আমি লিফ্‌টে নেমে যাব। গাড়ি রেখেছিলাম অনেক দূরে আর একটা আফিসের সামনে। গাড়ির নম্বর তুমি জান, কাছাকাছি গাড়ি রাখলে হয়তো তোমার নজরে পড়ে যাবে। প্যাকেটটা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে লিফ্‌টে ঢুকে পড়লাম। নীচে নেমে হাত দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেলাম। কেউ কোনও সন্দেহ করতে পারলে না।"

খপ করে খামচে ধরেছেন তখন কৃষ্ণার বাঁ কাঁধটা করুণাকেতন, কৃষ্ণা বুঝতে পারল হাতখানা তাঁর থরথর করে কাঁপছে।

জিজ্ঞাসা করল—"কি হোল আবার ? সেই টাকা তো নিয়েই এসেছি। এখনই চাও তো দিতে পারি।"

দাঁতে দাঁতে চিবিয়ে করুণাকেতন বললেন—"টাকা চুলোয় যাক। উঃ, কি সর্বনাশ হোত যদি ঐ সর্বনেশে টাকা হাতে নিয়ে তুমি বেরতে!"

আশ্চর্য হোয়ে পড়ল কৃষ্ণা, বেশ ভয়ও পেল যেন। জিজ্ঞাসা করল—"কি হোত ?"

"আমার মাথা, আমার এই মুণ্ডটা তুমি চিবিয়ে খেতে।" কথাটা আওড়ে করুণাকেতন দম ফেললেন। তারপর টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন—"যা হোত তা' তুমি জান। তুমিই বলেছ, যোগজীবনের কপালে কি ঘটেছে।"

হাসি জুড়ে দিলে কৃষ্ণা। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল করুণাকেতনের কোলের ওপর। করুণাকেতন হকচকিয়ে গেলেন।

অবশেষে শেষ চালটুকুও কবুল করলে কৃষ্ণা। যোগজীবনকে সে জানেও না চেনেও না। তার কি হোয়েছে, তার বিন্দুবিসর্গ খবর রাখে না সে। শুধু এইটুকুই শুনেছে যে যোগজীবন নামে একটা লোক করুণাকেতনের চাকরি করত। কি কাজ করত তাও শুনেছে।

করুণাকেতন বললেন—"তা'হলে সে মরেনি ?"

কৃষ্ণা বললে—"রামশ্চন্দ্রঃ, মরবে কোন্ দুঃখে সে, ঘরের ছেলে ঘরে চলে গেছে। তাকে সামলাবার জন্যে অন্য লোক আছে, তার মনিবটিকে আমি সামলাচ্ছি। মনিবটি না বেঘোরে মারা পড়েন, সেদিকে নজর রাখা আমার দায়। তাই রাখছি।"

"কিন্তু মারা পড়ব কেন ? কে মারবে ? যারা বোমা পিস্তল আমদানি করছে তারা মারবে ?"

"না, তারা অনর্থক খুন করে না। খুন করাটা তাদের পেশা নয়। যাদের কাছ থেকে টাকা পাচ্ছিলে তুমি, যারা তোমাকে দিয়ে তাদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছিল তারা মারবে। তারা খুনে, তারা যখন বুঝতে পারবে যে তুমি তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাবার মতলব করেছ, তখন তারা তোমায় বাঁচতে দেবে না।"

"কেন মারবে ? যতদিন ইচ্ছে আমি কাজ করেছি। এখন ইচ্ছে করছে না, করব না। কাজ করা না-করা আমার খুশি। আমি স্বাধীন, আমি তাদের কেনা গোলাম নই।"

কৃষ্ণা উঠে বসে ধীর স্থির অচঞ্চল ভাবে জবাব দিলে—"কেতন, স্বাধীনতা কথাটা তাদের তন্ত্রে লেখা নেই। মনুষ্যত্ব ন্যায়বিচার স্বাধীনতা এ কথাগুলো শুনলে তারা শিউরে ওঠে। লোভ ঘৃণা বিদ্বেষ তাদের মূলধন, মানুষের জীবনের দাম তাদের কাছে কানা-কড়িও নয়। তাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যে না খেতে পেয়ে

মরছে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, কাপড়ের অভাবে যে উলঙ্গ হোয়ে রয়েছে তাকে সাহায্য করা হোল অতি বড় পাপ কাজ। বিশ্বাসঘাতকতা আর খুন করা হোল তাদের ধর্ম। খুব শিগ্‌গির তাদের আসল পরিচয় পেয়ে যাবে তুমি। এখন খানিক ঘুমিয়ে নেওয়া যাক, সকাল হোয়েছে, লোকজন উঠে পড়ছে। এখন নিশ্চিন্তে একটু ঘুমনো যাবে।"

ওটি কপালে থাকা চাই। নিশ্চিন্তে ঘুমনোর কপাল নিয়ে সবাই দুনিয়ার বুকে ঘুরে বেড়ায় না। ভাল ভাল জিনিস দিয়ে উদর বোঝাই করে ভাল ঘরে ভাল বিছানায় ঘুমতে শুল যোগজীবন, একটানা ঘুমিয়ে রাতটা কাবার করতে পারবে এই আশায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। বাদ সাধল তার কপাল, ঘুম থেকে উঠিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে সাজাতে বসল যশোদা। একরাশ ময়লা কাপড় জামার ভেতর থেকে বেছে বার করল একটা সার্ট একটা কোট। যেগুলোর দশা দেখে মনে হোল, জন্মে পর্যন্ত তারা ধোপার বাড়ির দরজা মাড়ায়নি। সেই জাতের এক কাপড় জড়িয়ে দিলে মাথায়, পাগড়ি হোয়ে গেল। ঠোঁটের ওপর আটা লাগিয়ে এক গোঁফ আটকে দিলে। সাজপোশাক সমাপ্ত হোতে বললে—"দাঁড়ান গিয়ে আয়নার সামনে, দেখুন এখন নিজেকে চিনতে পারেন কি না।" বলেই পাশের ঘরে চলে গেল।

সত্যিই চেনবার উপায় নেই। যোগজীবন হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। কোথায় যোগজীবন রায়, তার বদলে পোড়-খাওয়া এক চা বাগানের সর্দার দাঁড়িয়ে আছে।

একটু পরে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল যশোদা। এ ঘরে পা দিয়েই যদি কথা না বলত তা' হলে হয়তো চেঁচিয়ে উঠত

যোগজীবন। চা-বাগানের পাতা তুলতে তুলতে হাড় পেকে গেছে, এমন এক নারী অর্ধেক রাতে ঘরে ঢুকে পড়লে চেঁচিয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। অল্প সময়ের মধ্যেই অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলেছে। রঙটা পর্যন্ত বদলেছে, মিশমিশে রঙ, কোথাও একটু সাদার আভাষ পাওয়া যায় না। চুলগুলো টানটান করে পেছন দিকে বেঁধে কপালখানি সম্পূর্ণ অনাবৃত করে ফেলেছে। লালরঙের এক জামা পরেছে। কাপড়খানার যে কি রঙ তা' বোঝা গেল না। সেখানা এমন ময়লা যে তার আসল বর্ণ তলিয়ে গেছে। হাতে কানে দু'একটা গয়নাগাঁটিও পরে ফেলেছে। এতটুকু ত্রুটি নেই কোথাও, সত্যিকারের শিল্পী, কত অল্প সময়ের মধ্যে বিলকুল ভোল ফিরিয়ে এল।

তারিফ করল যোগজীবন—"বাঃ, চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু।"

যশোদা বললে—"ধরা না পড়লে হয়। এখন থেকে মনে রাখুন, আমরা দুজন বাগানে কাজ করি। চলুন এখন, অনেক দূর যেতে হবে। যেতে যেতে না মিটিঙ ভেঙে যায়।"

যোগজীবন বললে—"চলুন।"

গলাসমান উঁচু চা গাছের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। দু'হাত দিয়ে গাছের ডাল সরাতে সরাতে এগতে হচ্ছে। তবু খোঁচা লাগছে। খোঁচা লাগলেও থামবার উপায় নেই, অদ্ভুত কায়দায় ছোট্ট শরীরখানিকে মোচড় দিতে দিতে অনায়াসে এগিয়ে যাচ্ছে যশোদা, একটু পিছিয়ে পড়লেই নজরের বাইরে অদৃশ্য হবে। যোগজীবন প্রাণপণে নজর রাখছে যশোদার মাথাটার ওপর। মাথাটাই শুধু জেগে আছে চা গাছের ওপর, মাঝে মাঝে তলিয়েও যাচ্ছে পাতার মধ্যে, তখন শুধু শব্দ শুনে বুঝতে হচ্ছে কোন্ দিকে

গেল যশোদা। এই ভাবে আধ ঘণ্টার ওপর চলবার পরে হঠাৎ চা গাছ শেষ হয়ে গেল। সামনেই এক খাদ, খাদটা পেরতে হবে।

যশোদা বললে—"এখন আপনি আমার কাঁধ ধরুন। ঠেলবেন না তা' বলে, বরং খানিকটা টেনে রাখবেন। আলগা নুড়ির ওপর দিয়ে নেবে যাব আমরা। এটা একটা শুখনো ঝরনা, এখন জল নেই, বর্ষার সময় তোড়ে জল নামে। পায়ের চাপে নুড়ি সরে যাবে, হড়-হড় করে খানিক নেমে যাব আপনাআপনি, আবার আটকেও যাব। হাত পা না ভাঙলেই হোল। সাবধানে নামুন।"

যোগজীবন বললে—"তার চেয়ে আমার পাগাড়িটা খুলছি। আপনি এক খুঁট ধরুন, আমি আর এক খুঁট ধরছি। পাগড়িটা যতখানি লম্বা ততখানি নেমে যান আপনি আগে, গিয়ে পা আটকে ভাল করে দাঁড়ান। তখন আমি নামব। যদি আপনার পা হড়কায় আমি টেনে রাখব। যদি আমার পা হড়কায় আপনি টেনে রাখবেন। এই ভাবে নামলে একেবারে নীচে গিয়ে পৌঁছব না কেউ, পাগড়িই আমাদের মাঝপথে আটকাবে।"

যশোদা বললে—"দরকার নেই আর পাগাড় খুলে, আবার মানানসই করে বাঁধতে হবে। এই অন্ধকারে খুঁত থাকলেও ধরা যাবে না। তার চেয়ে নামুন আমার কাঁধ ধরে, দেখুন না আপনাকে ঠিকঠাক নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।"

নামা শুরু হোল। ডান হাত দিয়ে যশোদার ডান কাঁধটা ধরতেই হোল যোগজীবনকে। প্রথমে সে আলতো ভাবে রেখেছিল হাতটা। দু'একবার পায়ের তলার নুড়ি সরতেই দস্তুরমত খামচে ধরল। তারপর প্রায় একনিশ্বাসে জড়ামড়ি করে নেমে পড়ল দুজনে নীচে, কে যে কাকে টেনে রাখল, কে যে কাকে ঠেলে রাখল, বোঝাই গেল না।

নীচে পৌঁছে দু'মিনিট দাঁড়িয়ে দম ফেলবারও ফুরসত দিলে না যশোদা। বললে—"চলুন, এখন এই খাদের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি গেলেও আরও আধ ঘণ্টা। সাধারণতঃ রাত বারোটার পরে ওরা জমা হয়, রাত দু'টো তিনটে পর্যন্ত মিটিঙ চলে। আমরা বেরিয়েছি বারটার পরে, পৌঁছতে পৌঁছতে দেড়টা হবে। সবটুকু শোনা হবে না।"

এতক্ষণ পরে সুযোগ পেল যোগজীবন প্রশ্ন করবার। জিজ্ঞাসা করলে—"কি মিটিঙ? কাদের মিটিঙ? অর্ধেক রাতে মিটিঙ হচ্ছে কেন?"

যশোদা বললে—"চলুন না, সবই স্বচক্ষে দেখবেন, স্বকর্ণে শুনবেন। ওদের একটা মিটিঙ আপনাকে দেখাতে হবে। তারপর আর আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।"

যোগজীবন বুঝেছিল যে ফালতু প্রশ্ন করলে খেলো হোয়ে পড়তে হবে। কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করাটা হয়তো এদের কাছে আইন-বিরুদ্ধ। তবু একটা কথা না জিজ্ঞাসা করে সে থাকতে পারল না। পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে বললে—"তাঁকে কিন্তু আর দেখতে পেলাম না।"

যশোদা বললে—"কাকে? আমার বাবাকে? ও হো, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। বাবা হঠাৎ চলে গেলেন আসাম। আপনার সঙ্গে দেখা করে যাবার সময় পেলেন না। আপনাকে জানাতে বলে গেছেন যে আপনি আপনার বাড়ির কথা ভাববেন না। সেখানে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েছে।"

যোগজীবন বুঝল, খামকা খানিকটা খেলো হোয়ে পড়ল।

মিটিঙ বসেছে রেললাইনের ধারে একটা ভাঙা টিনের চালার

তলায়। রেলের লোক ওটাকে বানিয়েছিল মালপত্র রাখবার জন্যে, কাছাকাছি কোথাও পোলটোল সারানো হোয়েছিল বোধ হয়। সে সময় লোকজন মালপত্র এনে জমা করেছিল ওখানে। সে কাজটা হোয়ে গেছে, ঘরটা ভেঙে নিয়ে যায়নি। সম্পত্তিটা ভেঙে সরিয়ে নেবার মত নয়, রেললাইনের তলায় যে কাঠ পাতা থাকে তাই খাড়া করে পুঁতে দেওয়াল বানান হয়েছে, চাল বানানো হোয়েছে খানকতক টিন পেতে। দেওয়াল চাল সবই ঝাঁজরা, এমন ঝাঁজরা যে খুলে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র কাজে লাগানো যাবে না। সেই ঘরের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশ জন লোক ঠাসাঠাসি করে বসেছে। ওরা দুজন যখন পৌঁছল তখন বক্তৃতা শুরু হোয়েছে। ঘরখানির চারপাশে পাহারা আছে। এক পাহারাদার সামনে পড়ে গেল। যশোদা কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভেতর থেকে দু'টুকরো কাগজ বার করে তার হাতে দিল। টর্চের আলোয় সে একবার দেখে নিলে টুকরো দুটো। দেখে ফেরত দিয়ে হাত নেড়ে হুকুম দিলে এগিয়ে যাবার। ওরা দরজার সামনে গিয়ে উবু হোয়ে বসে পড়ল।

দরজা অর্থে সেই জায়গাটায় কয়েকটা কাঠ খাড়া করা নেই। সেখানে বসে ঘরের ভেতরটা দেখা গেল। আলো জ্বলছে, টিনের কৌটোর ভেতর কেরোসিন পুরে মোটা পলতে ডুবিয়ে পলতেয় আগুন দেওয়া হোয়েছে। একটা নয়, গোটা পাঁচ ছয় সেই জাতের আলো ঝুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে ঘরের চালে। তাতে আলো যতটুকু হোয়েছে, তার একশ গুণ বেশী হোয়েছে ধোঁয়া। কেরোসিনের ধোঁয়ায় আর গন্ধে দম আটকে আসার উপক্রম হোল। তবে ওরা বাইরে বসে ছিল এই যা রক্ষে।

আলো যেমনই হোক, বক্তৃতাটা সবই শোনা গেল। ধোঁয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তা হিন্দী বাঙলা মেশানো জবান ছোটাতে

লাগলেন—"ভারত মাতা আজাদ হো গিয়া হায়। মিত্র লোক আ গিয়া হায়। নেপাল ভুটানমে আজাদী কায়েম হো গিয়া হায়। লেও এক এক লাল রসিদ, রাখ দেও আপনা পাস, যব মিত্র লোক পৌঁছায়গা ইধার, ঐ রসিদ দেখলাও। ইয়ে রসিদ যিসকা পাস রহেগা, উসকো সব কুছ মিলেগা। আউর নজর রাখ, হারামজাদ মালিক লোক কোই চিজ লেকর ভাগনে নেই শেকে। সব কুছ তুম লোক বানায়া, বাগিচা ফ্যাক্টরী, গাড়ী লরি যো কুছ হায় হিঁয়া পর, সব কুছকা মালিক কোন হায়? তুম লোক মালিক হায়। হুঁশিয়ার রহো, হারামজাদ মালিক লোক কই চিজ লেকে নেহি ভাগনে শেকে।"

অদ্ভুত ভাষা, আশ্চর্য বলার কায়দা এবং অতি সাংঘাতিক বক্তব্য। বলতে বলতে বক্তা বলেই ফেললেন যে যারা আজ মালিক সেজে বসে আছে, তাদের ঘরে যে খবসুরত আওরতরা রয়েছে, যারা সেজেগুজে ভাল কাপড় জামা পরে গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়, সেগুলোও তোমাদের সম্পত্তি। তিব্বত নেপাল ভুটানকে আজাদী দিয়ে যে মিত্ররা আসছেন, তাঁরা সর্বাগ্রে তোমাদের অধিকার দেবেন মালিকদের সেই আওরতগুলোকে ইচ্ছামত ব্যবহার করবার। তোমাদের আওরতরা খেটে খেটে যে টাকা বানিয়েছে সেই টাকায় ঐ আওরতরা আরামে খেয়ে দেয়ে মোটর চড়ে বেড়িয়ে খবসুরত হোয়েছে। অতএব সেই সমস্ত সম্পত্তিও তোমাদের। মুক্তিফৌজের জন্য চাঁদা তোল, বেদম চাঁদা তোল, আর চাঁদার লাল রসিদখানি রেখে দাও। এসে পড়ল বলে মুক্তিফৌজ, পৌঁছে গেছে বললেও হয়। কয়েকদিন পরে আর খেটে খেতে হবে না। হরদম গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াবে, মালিকদের খবসুরত লেড়কি একটি পাশে বসিয়ে নিয়ে ঘুরবে। কোনও চিন্তা নেই। চাঁদার রসিদখানি দেখালেই মুক্তিফৌজ তোমাদের মিত্র বলে চিনতে পারবে।

বক্তা দম নেবার জন্যে থামলেন। শ্রোতারা চাঁদার বই কিনে ফেললে কয়েকখানা। প্রতি বইতে পঁচিশখানি করে রসিদ আছে। পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়ে এক একখানি বই নিতে হোল। ওরা নিজেদের বাগানে গিয়ে টাকা তুলে নেবে।

অতঃপর আসল বক্তব্য উত্থাপিত হোল। ওখানকারই এক চা বাগানের মালিক, যার নাম দস্তিদার সাহেব, সেই দস্তিদার সাহেবটি নাকি পহেলা নম্বরের শয়তান। লোকটার এত বড় স্পর্ধা যে সে মুক্তিফৌজকে বাধা দেবার জন্যে দল পাকাচ্ছে। বোমা রিভলভার কামান বন্দুক পর্যন্ত আমদানি করে ফেলেছে। পাঞ্জাব বোম্বাই কলকাতা মাদ্রাজ সব জায়গা থেকে লোক যোগাড় করছে। মুক্তি-ফৌজের যে সব লোক কলকাতায় আছে, তারা সংবাদ পাঠিয়েছে যে ঐ দস্তিদার সাহেবটিকে সাবাড় করতে হবে। ঐ লোকটাকে সাবাড় না করতে পারলে খুবই বদনাম হবে। মুক্তিফৌজ মনে করবে যে—

মুক্তিফৌজ কি মনে করবে তা' আর বলতে হোল না। একজন বেশ মুরুব্বী গোছের শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, স্রেফ ছুটো দিন, ছ'দিনেই সেই দস্তিদার সাহেব ভবনদীর ওপারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু লোকটা যে হরদম বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। তাকে হাতে পাবার উপায় কি ?

উঠে দাঁড়াল একজন রোগা ছোকরা। অসম্ভব ঢেঙা সে, অসম্ভব নেশা করে এসেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, উপায় আছে। সেই হারামজাদা দস্তিদারের এক মেয়ে থাকে বাঙলোয়। মেয়েটাকে পাহারা দেয় ছুটো কুকুর আর কয়েকটা নেপালী নোকর। মেয়েটাকে যদি—

যদি পর্যন্ত বলতে গোটাকতক হেঁচকি উঠল তার, তাই বাকী-

টুকু সে ইশারায় বুঝিয়ে দিলে। ইশারাটা বড্ড বেশী লোভজনক, অনেকেই বেশ চঞ্চল হোয়ে উঠল।

তখন শুরু হোল পরামর্শ। নেপালীগুলোকে কি ভাবে খতম করা যায়, কুকুর দুটোকে কেমন করে সাবাড় করতে হবে, এই সমস্ত দরকারী পরামর্শ চলতে লাগল। যশোদা একটি খোঁচা দিলে যোগজীবনকে, ওরা দুজনে উঠে পড়ল। গুরুতর পরামর্শে মশগুল হোয়ে রইলেন সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ, ওদের পানে নজর দেবার কারও ফুরসতই হোল না।

ফেরবার সময় খাদে নামতে হোল না, চা গাছের ভেতর ঢুকে খোঁচা খেতে হোল না। রেললাইন ধরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে এক নদী পাওয়া গেল। ওদেশের নদী যেমন হয়, বড় বড় নোড়ানুড়ি বোঝাই আধ মাইল চওড়া একটা পথ, এক দিক থেকে এসে আর এক দিকে চলে গেছে। রেললাইন ছেড়ে সেই পথে নেমে পড়ল যশোদা, যোগজীবন কেঁপে উঠল ভেতরে ভেতরে। নোড়ানুড়ি টপকে চলতে চলতে মনে পড়ল চীনে দুটোকে। কে জানে কাছাকাছি কোথাও তারা এখনও পড়ে আছে কি না। এতক্ষণ কি আর পড়ে থাকতে পাবে, দিনের বেলা চিল শকুনে শেষ করে ফেলেছে। শেয়ালটেয়ালও খোঁজ পেতে পারে।

একটা অবান্তর প্রশ্ন করে ফেললে যোগজীবন—"এধারে বাঘ ভাল্লুক নেই?"

অন্যমনস্ক হোয়ে হাঁটছিল যশোদা, জিজ্ঞাসা করল—"কি বললেন?" জিজ্ঞাসা করে ফিরে দাঁড়াল।

যোগজীবন বললে—"এই হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কথা বলছি। যে ভাবে আমরা চলছি—"

"বাঘ ভাল্লুক শুধু শুধু আক্রমণ করতে আসে না।" শব্দ করে হেসে উঠল যশোদা, যেন খুবই একটা মজার কথা বলছে এই ভাবে বললে—"নিজেই শুনে এলেন ওঁদের সলাপরামর্শ। বাঘ ভাল্লুকরা কি ওঁদের কাছে দাঁড়াতে পারে।"

"সেই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি"—যোগজীবন এবার জোর পেল আসল কথাটা উত্থাপন করবার। বেশ জোরের সঙ্গেই বললে—"যা শুনে এলাম, তারপর আপনার এভাবে চলাফেরা করাটা কি উচিত হচ্ছে?"

যশোদা যেন গ্রাহ্যই করল না যোগজীবনের অনুযোগ। একটা গল্প শুরু করে দিলে—"আমার এক পিসী আছে, তাকে আপনি দেখেও থাকতে পারেন। আপনার সেই সাহেব মনিবটির সঙ্গে আমার পিসীটি লড়াই চালাচ্ছেন আজ দশ বার বছর। সেই পিসী একসময় এখানে ছিল। তখন পিসীর বয়েস আঠার বা বিশ। মেয়েদের স্কুলে পড়াশুনা করত, ছুটিতে এখানে এসে থাকত। একবার হোল কি, কতকগুলো ছোকরা মদ খেয়ে বেহুঁশ হোয়ে পিসীকে ঘিরে ফেললে। টাট্টু চেপে পিসী বেড়াতে গিয়েছিল। সেদিন ছিল হাটবার। হাট থেকে নেশা করে ফিরছিল ছোঁড়া-গুলো। রাস্তায় এক প্রাণী নেই, সন্ধ্যা প্রায় হোয়ে এসেছে, পিসী পড়ে গেল ছোঁড়াগুলোর মাঝখানে। ঘোড়া ধরে তারা পিসীকে টেনে নামালে। তারপর কি হোল জানেন?" বলেই হাসি জুড়ে দিলে যশোদা, দু'হাতে মুখ ঢেকে হিহি হিহি, হাসি আর থামতে চায় না।

যোগজীবন বলল—"হাসবার কি আছে এতে। ওরা সব পারে। ওদের অসাধ্য কর্ম নেই।"

হাসি থামিয়ে যশোদা বললে—"শুনুন শেষ পর্যন্ত আগে, তারপর আপনার অভিমত শোনাবেন। পিসী তাদের বললে—

দাঁড়াও, আগে আমার কথা শোন, তারপর যা ইচ্ছে করবে। আমি তোমাদের মধ্যে আজ দুজনকে পছন্দ করব। দুজনের সঙ্গে রোজ আমি এই সময় এখানে দেখা করব। তোমাদের মধ্যে সেই দুজনকে, আগে ঠিক কর। আজ দুজন কাল দুজন, এমনি ভাবে রোজ দুজন। আজ যারা থাকবে আমার সঙ্গে, কাল তারা আসতে পাবে না। বুঝলে ব্যাপারটা, এখন কে কে আসবে, এসে দাঁড়াও আমার দু'পাশে। বাকী সবাই আজ চলে যাও। কাল আবার এই সময় ঠিক এইখানে নতুন দুজন এস। এই পর্যন্ত বলে পিসী নিজের সাজপোশাক খুলতে লেগে গেল। তারপর কি হোল বলুন তো ?"

নির্বাক হোয়ে স্রেফ মাথা নাড়ল যোগজীবন। অর্থাৎ বলতে পারবে না।

যশোদা বললে—"আন্দাজ করুন না।"

যোগজীবন মাথাও নাড়ল না আর, স্তব্ধ হোয়ে তাকিয়ে রইল ওর মুখপানে।

যশোদা পেছন ফিরে শুরু করে দিল পা চালানো। কয়েকটা পাথর টপকে বললে—"পারলেন না আন্দাজ করতে তা'হলে। জানতাম, পারবেন না। ওদের চেনেন না যে, কি করে ধারণা করবেন ওরা কেমন জাতের জন্তু। তারা তৎক্ষণাৎ মারামারি শুরু করলে। কোন্ দুজন প্রথম সুযোগ লাভ করবে সেদিন তা' ঠিক করতে হবে তো। সেই সুযোগে পিসী টাট্টুর ওপর লাফিয়ে উঠে পগার পার।"

যোগজীবন আর একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার পিসীমার নাম কি ?"

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল যশোদা—"কৃষ্ণা দস্তিদার। দস্তিদার উপাধিটা বদলে ফেলেছে। দত্ত হোয়ে পড়েছে। বিয়েই হোল

না সেই দত্ত সাহেবের সঙ্গে, কোনও কালে তিনি বিয়ে করবেন কি না পিসীকে তারও ঠিক নেই, আগে থাকতে পিসী নিজের নামের সঙ্গে দত্ত জুড়ে নিয়েছে। আদিখ্যেতার চূড়ান্ত।”

যোগজীবন ভাবতে শুরু করলে। অনেক রকমের অনেক মহিলাকে দেখেছে সে মনিবের সঙ্গে, তার মধ্যে কোন্‌টি যে কৃষ্ণা, তা' তো সে জানে না। মনিবের জীবনের ঐ দিকটা সম্বন্ধেও সে কখনও কিছু জানবার চেষ্টা করেনি। মহিলাটির নাম কৃষ্ণা, কখনও যদি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তা'হলে তাঁকে এই কথাটি জানিয়ে দেবে যোগজীবন যে সময় পালটেছে, জানোয়াররাও আর জানোয়ারের মত সরল নেই। জানোয়ারদের পেছনেও উকিল মোক্তার লাগতে পারে।

নদীর এপারে পৌঁছে গেল ওরা। যশোদা বললে—“এবার খানিকটা চড়াই, চড়াইটা পার হোলেই পথ শেষ হোল।”

যোগজীবন বললে—“চলুন।”

চলা সহজ নয়। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার জমে বসে আছে। হাত দু'য়েক সামনেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চড়াই ভেঙ্গে উঠতে হচ্ছে। যশোদা আছে সামনে, খুবই কাছে আছে। তাকে দেখা না গেলেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে কোন দিক দিয়ে উঠছে সে। শব্দও হচ্ছে না, দেখাও যাচ্ছে না, তবু বোঝা যাচ্ছে। সেটা সম্ভব হচ্ছে কেমন করে তাই ভাবছিল যোগজীবন আর সাবধানে চড়াই ভাঙছিল। হঠাৎ যশোদা জিজ্ঞাসা করলে—“হাতটা ধরবেন আমার?”

থতমত খেয়ে গেল যোগজীবন। বললে—“হাত ধরব! কেন?”

"বড্ড অন্ধকার কিনা। কোথায় পা দিতে কোথায় পা দেবেন। দেখতে পাচ্ছেন না তো কিছুই।"

"আপনি দেখতে পাচ্ছেন কেমন করে?"

"এ পথে যাওয়া আসা আমার অভ্যাস আছে যে। আপনি বরঞ্চ আমার হাতটা ধরুন।"

যোগজীবন বলল—"দরকার নেই, চলুন। আমি বেশ বুঝতে পারছি কোন দিক দিয়ে আপনি যাচ্ছেন।"

আরও খানিক উঠে যশোদা বলল—"আপনার সেই কথাটা মনে পড়ছে।"

"কোন কথাটা?"

"সেই যে বলেছিলেন, কতক্ষণ যে বেঁচে আছেন তার ঠিক নেই, হঠাৎ কেউ হয়তো আড়াল থেকে গুলি করে বসতে পারে।"

বুকটা একটু কেঁপে উঠল যোগজীবনের—কয়েক মুহূর্ত্ত দেরি হোল জবাব দিতে। সামলে নিয়ে সহজ ভাবে বলল—"পারেই তো। আমার সঙ্গে আসা আপনার উচিৎ হয়নি। এই অন্ধকারে দু'শ পাঁচশ লোক যদি থাকে চারিদিকে তা'হলেও জানা যাবে না। আমার জন্যে আপনাকেও হয়তো—"

"কিংবা আমার জন্যে আপনাকে"—যশোদা ফোঁস করে উঠল। প্রায় ঝগড়া করবার মত করে বলতে লাগল—"কেন, আমিই বা কম কিসে? ঐ তো শুনে এলেন, আমার জন্যে—কেমন চমৎকার ব্যবস্থা করার পরামর্শ হচ্ছে। ওঁদের গুষ্টির কেউ হয়তো এই অন্ধকারে ওত পেতে থাকতে পারেন। সে দিন যেমন হোয়েছিল। চীনে দু'টো যাতে মুখ খুলে কিছু বলতে না পারে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন এঁরা। বাবা আর আপনি যে বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন এজন্যে—"

"শুধু আমরাই বেঁচেছি।" আঁতকে উঠল যোগজীবন, বাকী

কথাগুলো কেমন যেন জড়িয়ে মড়িয়ে বেরুল—"আর সেই ছেলে দু'টি, যারা আমার দু'পাশে বসে এল—"

"টুকরো টুকরো হোয়ে উড়ে গেছে"—নিতান্ত নিঃস্পৃহ কণ্ঠে যশোদা জবাব দিলে। আরও খানিকটা চড়াই ভাঙবার পর বললে—"এঁরা একটা হাতবোমা ছুঁড়েছিলেন। পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিলেন দু'জন, আপনারাও মরতেন আরও খানিক এগিয়ে এলে। পাণ্ডার জন্যে সেটা ঘটতে পারে নি। বাঙলোয় গাড়ি তুলে দিয়ে ওপর থেকে সে নিচে নামছিল। পেছন থেকে তাঁদের দু'জনকে দেখতে পায়। পাণ্ডার হাতের কুকরিতে তাঁরা কচু কাটা হন। টু শব্দ করার সুযোগ পান নি। আরও কয়েকটা হাত বোমা পাওয়া গেছে তাঁদের কাছে। পাণ্ডা সেগুলোকে নিয়ে এসেছে।"

যোগজীবন আর কিছু বলতেই পারল না। ছেলে দু'টির সেই খিক খিক করে হাসির আওয়াজ যেন সে স্পষ্ট শুনতে লাগল। টাটকা তাজা দু'টি ছোকরা, কি দোষ করেছিল তারা! কেন তারা অমন ভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাল!

খুব বেশী হিসেব না করেই জবাবটি পেয়ে গেল। তার জন্যে, একটা রাস্তার কুকুর হতভাগা যোগজীবন রায়ের জন্যে তারা দুনিয়ার বুক থেকে চিরকালের জন্যে বিদেয় নিলে। এই মেয়েটাও মরতে বেরিয়েছে। মরণটাকে এরা ছেলেখেলা বলে মনে করে। যোগজীবন রায়ের সঙ্গে পথচলা কত বড় সাংঘাতিক কাজ, তা' ভাল করে জেনেও ঐ মেয়ে যোগজীবনের সঙ্গে হাঁটছে। এরই নাম জীবনের সঙ্গে সত্যিকারের ফক্কুড়ি করা।

রাগে তার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলতে শুরু করলে। কয়েকটা বিষাক্ত কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল—"তুমি ভাল করে জান যে আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার ফল কি। তবু তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলে।

কি বলব, তুমি আমার আত্মীয় নও। কোনও সম্বন্ধ যদি থাকত তোমার সঙ্গে, তা'হলে এই রকম সাংঘাতিক সাহস দেখাবার জন্যে আজ তোমায় শায়েস্তা করে ছাড়তাম।"

বেশ খানিকটা আগে থেকে যশোদা বললে—"ভয় দেখাচ্ছেন কেন মিছিমিছি। বাবা বলেছে, আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কোনও বিপদ ঘটবে না। আপনার দুর্দান্ত সাহস, যে ভাবে হোক আপনি আমাকে ঠিক বাঁচাবেন।"

"এই অন্ধকারে আমি কি করতে পারি? যদি কেউ লুকিয়ে থাকে আশে পাশে—"

যশোদা এবার হেসে উঠল। হাসিটা যোগজীবনের কানে খুব মিষ্টি লাগল না। বললে—"এটা কি হাসির কথা হোল?"

যশোদা জিজ্ঞাসা করল—"মুখে আঙ্গুল দিয়ে সিটি দিতে পারেন আপনি?"

"পারি বোধ হয়, আগে পারতাম, অনেক দিন অভ্যাস নেই।"

"এই দেখুন আমি কেমন সিটি দিচ্ছি"—বলেই যশোদা সিটি দিলে। সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ উঠল খুবই কাছ থেকে। ভয়ঙ্কর রকম চমকে উঠল যোগজীবন। তারপর বুঝতে পারল ব্যাপারটা। মিনমিন করে বলল—"এতক্ষণ বললেই পারতেন। ওরা যে আপনার সঙ্গে আছে তা' বুঝতে পারি নি।"

যশোদা বলল—"ওরা সঙ্গে না থাকলে কি রাত্রে বেরুতে পারি আমি! ওদের চোখ দিয়ে আমি দেখি, ওদের কান দিয়ে শুনি। সব চেয়ে দামী যন্ত্র হচ্ছে ওদের নাক। ধারে কাছে কেউ থাকলে ওরা হাওয়ায় গন্ধ পেত। ওরা আছে বলেই তো—"

"আগাগোড়াই তা'হলে ওরা আমাদের সঙ্গে আছে। বাঃ,

আমি কিন্তু একেবারে টের পাই নি।" যশোদা বলল—"সেইটুকুই ওদের সত্যিকারের বাহাদুরি।"

সত্যিকারের একটি বাহাদুরি দেখাবেন ঠিক করলেন করুণা কেতন, কৃষ্ণা দস্তিদারকে আইনসম্মত কৃষ্ণা দত্ত বানাবার প্রস্তাব করে বসলেন। বললেন—"এবার ফিরে গিয়েই রেজেস্ট্রী করতে হবে। আর নয়, এবার পাকাপাকি ব্যবস্থা।"

কৃষ্ণা বলল—"এবার নিয়ে কতবার হোল! দাঁড়াও, হিসেব করি।"

করুণাকেতন বললেন—"লাভ নেই। যে জীবনটা খরচা হোয়ে গেছে তা' নিয়ে হিসেব করলে নিজেকে অপমান করা হয়। নতুন জীবন নিয়ে হিসেব কর, যে জীবন আমরা শুরু করতে চলেছি, সেই জীবন নিয়ে মাথা ঘামাও।"

"তাতেও কোনও লাভ নেই। সর্ব-স্বত্ব-সংরক্ষিত ব্যাপারটা তুমি বরদাস্ত করতে পারবে না।"

"নিশ্চয়ই পারব। বেঁচে আছি, এই চৈতন্যটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার নাম বেঁচে থাকা। তোমার পানে তাকিয়ে সেইভাবে বেঁচে থাকব।"

"তার মানে?"

"তার মানে তোমার জন্যে বেঁচে থাকব। আমি বেচে থাকলে তুমি সুখী হবে তাই বেঁচে থাকব।"

"দু'দিনে বিস্বাদ লাগবে। তখন আমাকেই বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করবে।"

"তাও করতে পারি। তারপর নিজেও বিষ খাব কারণ তারপরও বেঁচে থাকবার মত হ্যাংলা আমি নই।'

আর কথা বাড়াল না কৃষ্ণা। করুণাকেতনের চোখের পানে তাকিয়ে চুপ করে গেল। দেখল, চোখের মধ্যে ঠাণ্ডা আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।

তারপর ওরা তোড়জোড় শুরু করল পাহাড় থেকে নামবার।

দশ হাজার টাকা কৃষ্ণার নামেই ব্যাঙ্কে জমা করে দিলেন করুণাকেতন। ঠিক হোল যে ক্লাব ক্লাসিকে আর উঠবেন না তিনি, সোজা কৃষ্ণার ফ্ল্যাটেই চলে যাবেন। চাকরিটাও ছেড়ে দেবেন, অল্পস্বল্প যা আছে তা' দিয়ে একটা মোটর গাড়ি সারাবার কারখানা খুলে ফেলবেন। ঐ কাজটা তিনি ভালভাবে জানেন। আফিসের গাড়ি চড়ে বেড়াতেন বলে নিজের গাড়ি কেনেননি। খানকতক পুরনো গাড়ি কিনে সারিয়ে রঙ করে ভাড়া খাটাবেন। পুরনো গাড়ির কেনা বেচায় লাভ হয় প্রচুর। ঐ কারবারটার ওপর তাঁর ঝোঁক আছে, গাড়ির নাড়ি টিপে তিনি বুঝতে পারেন কার কি অবস্থা। সুতরাং ঐ কারবারেই লেগে পড়বেন।

সংসারী হোতে চলেছেন করুণাকেতন। তাই সংসারী মানুষের মত ছোঁকছোঁক করতে লাগলেন। বিকেলবেলা বেড়াতে গিয়ে মোটর গাড়ির আড্ডায় ঘুরঘুর করতে থাকেন। কথায় কথায় দু'একজন গাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোল। করুণাকেতনের জ্ঞান দেখে তারা আশ্চর্য হোয়ে গেল। কোন্ গাড়ির কি অবস্থা, একটিবার ইঞ্জিনটির পানে তাকিয়েই তিনি বলতে শুরু করেন। তাঁর মতলব মত এটা সেটা পালটে দু'একখানি গাড়ির নবজন্ম লাভ হোল। তারপর দাঁও বুঝে একখানি গাড়ি কিনে ফেলবার তালে রইলেন তিনি। কথাটা রাষ্ট্র হোয়ে পড়ল গাড়িওয়ালাদের ভেতর। অতঃপর যেমনটি চাইছিলেন, ঠিক তেমনি একখানি গাড়ি পেয়ে কিনে ফেললেন। তখন আর কোনও কথা নয়, নিজেদের গাড়ি চেপেই ফিরবেন ঠিক হোল। হাওয়াই

জাহাজে যাওয়াটা স্রেফ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পৌঁছনো। মোটর গাড়ি চেপে যাওয়ার মত আরাম আছে। সমস্ত পথটা চাখতে চাখতে যাওয়া যায়।

একজন ড্রাইভার চাই। একলা অতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসলে বেধড়ক পরিশ্রম হবে। কৃষ্ণা চালাতে পারে, নিজের গাড়ি সে চালায়। কিন্তু তাতেই বা সুখ কোথায়। মাঝে মাঝে দুজনে বসবেন পেছনের সীটে, ড্রাইভার তখন চালাবে। অতএব একজন ড্রাইভার নেওয়া ঠিক হোল। বিস্তর ড্রাইভার বসে আছে গাড়ির অভাবে, অনেকে এগিয়ে এল। বাচ্চা সিংকে করুণাকেতন পছন্দ করে ফেললেন। বাচ্চা সিং বাচ্চা নয়, যথেষ্ট বয়েস হোয়েছে, দাড়ি গোঁফ সাদা হোয়ে গেছে। লোকটি ত্রিশ বছরের ওপর গাড়ি চালাচ্ছে। বাচ্চা সিং কলকাতায় আসবার জন্যে চেষ্টা করছিল, কলকাতায় আসা হবে কিছু টাকাও রোজগার হবে, এমন সুযোগ পেয়ে সে বর্তে গেল।

ওঁরা রওয়ানা হোলেন।

পাহাড়ী পথটা শেষ হবার আগেই ভোর হোয়ে গেল। বাচ্চা সিং পাহাড় থেকে নামিয়ে আনলে গাড়ি, তারপর করুণাকেতন চালাতে শুরু করলেন। কৃষ্ণা বসল পাশে, বাচ্চা সিং পেছনে গেল। প্রায় সারাটা দিনই করুণাকেতন চালালেন। মাঝখানে দু'একবার চা খাবার জন্যে থামতে হোল। মহানন্দার পাড়ে পৌঁছে বাচ্চার হাতে গাড়ি দিলেন। মহানন্দায় হাঁটুজল, গাড়িকে নৌকোর ওপর উঠিয়ে বহুকষ্টে এপারে নিয়ে আসা হোল। প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে গেল মালদা শহরে পৌঁছতে। বাচ্চা বললে, চমৎকার ব্যবস্থা আছে ঐ শহরে রাত কাটাবার। এক পেট্রোল পাম্পওয়ালা

কয়েকখানি সাজানো ঘর ভাড়া দেয়। প্রতি ঘরে দুখানি খাটিয়া আছে, ভাড়া মাত্র পাঁচ টাকা। যারা মোটর গাড়িতে ঐ পথে যাওয়া আসা করে, তারা পেট্রোল পাম্পের ঘর ভাড়া নেয়।

সেখানেই গাড়ি নিয়ে উঠল বাচ্চা সিং। প্রচুর জল, স্নানের ঘরও চমৎকার। বাচ্চা সিং তার জানা দোকান থেকে মাংস চাপাটি চাটনি এনে দিলে। রাতটা শান্তিতে কাটল। ভোরে আবার যাত্রা। করুণাকেতন ড্রাইভারের সীটে বসলেন। আবার যখন নদীর ধারে পৌঁছবেন তখন বাচ্চাকে চালাতে দেবেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘটল যা ঘটবার। ও রাস্তায় প্রচুর গরুর গাড়ি আসা যাওয়া করে। এমন গরুও থাকে যারা মোটর গাড়ির আওয়াজ পেলে ভড়কে যায়। করুণাকেতন দেখলেন, অনেক আগে একখানি গরুর গাড়ি চলেছে রাস্তার বাঁ ধার দিয়ে। তার কাছাকাছি পৌঁছতেই হঠাৎ গাড়িখানা ডান ধার ঘুরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল। অগত্যা তিনি গাড়ি থামালেন। সঙ্গে সঙ্গে দু'পাশ থেকে কয়েকজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল গাড়ির ওপর। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুসম্পন্ন হোয়ে গেল কাজ। করুণাকেতন দেখলেন, এক হাত লম্বা কৃপাণটা চালিয়ে একটা লোকের একখানা হাত গাড়ির গা থেকে খসিয়ে ফেললে বাচ্চা সিং। খানিকটা তাজা রক্ত ছিটকে এসে তাঁর মুখে লাগল। কৃষ্ণা যেন কি বললে চিৎকার করে, তিনি দরজাটা খুলে বেরবার চেষ্টা করলেন। হঠাৎ তাঁর মাথার ওপর ঘা লাগল। তারপর আর তিনি কিছু দেখতেও পেলেন না শুনতেও পেলেন না, স্টিয়ারিঙের ওপর তাঁর মুখখানা ঠুকে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে একখানা লরি এসে পড়ল সেখানে, লরিখানা কলকাতার দিক থেকে খালি অবস্থায় ফিরছিল। রাস্তার মাঝখানে একটা লাশ পড়ে আছে দেখে ড্রাইভার লরি থামাল। নেমে দেখল,

তারই স্বজাতি। ভাল করে উলটে পালটে দেখল লাশটা। গাড়ির ধাক্কা খায়নি, খুন করা হোয়েছে। দু'হাতের কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত, বাঁ পাশের পাঁজরায় এক গর্ত। তখনও সেখান থেকে একটু একটু করে রক্ত বেরচ্ছে। তুলে নিল তারা লাশটিকে, স্বজাতির লাশ ওভাবে পথে পড়ে থাকতে পারে না।

আর একবার করুণাকেতনের গাড়িখানা নৌকোয় চড়ে মহানন্দা পার হোল, স্বস্থানে ফিরে চলেছে। সব ঠিক আছে, ভাল করে ধোওয়া মোছা হোয়েছে আর নম্বর প্লেটটি পালটে গেছে। অর্থাৎ আসল পরিচয় আর নেই।

পরিচয়টা ঘুচে যাওয়াই আসল কথা। খোল নলচে পালটে গেলেও পরিচয়টা পালটায় না, এই হোল সব থেকে বিড়ম্বনা। সেই বিড়ম্বনায় পড়ে গেছে এক নারী, তাই সে হাঁটছে, শুধু হাঁটছে। হাত দশেক লম্বা হাত ছয়েক চওড়া একটা কাঠ দিয়ে বানানো খাঁচা, খাঁচার মধ্যে অনবরত হাঁটছে পা টেনে টেনে। শব্দ হচ্ছে মচ্ মচ্ মচ্ মচ্, কারণ সেই খাঁচাটা তৈরী হোয়েছে খোঁটার ওপর মাটি থেকে দু'মানুষ ভোর উঁচুতে। মোটা তক্তা পেতে তৈরী হোয়েছে ঘরের মেঝে, দেওয়ালও তক্তার তৈরী। ঘরের চালে খড়ের ছাউনি। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সেই ঘর, ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ঘরের মধ্যে আছে একটা মাটির কলসী আর একটা কলাইওঠা গেলাস। এক ধারে পড়ে আছে একখানা ছেঁড়া মাদুর আর একটা তেলচিটে বালিশ। ব্যাস, আর কিছুই নেই শুধু ঐ নারীটি ছাড়া। মানবী না প্রেতিনী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। চুলগুলো দেখলে মনে হয়, একটা ভয়ংকর কাণ্ড কিছু ঘটে গেছে মাথার ওপর। টেনে উপড়ে ফেলা হোয়েছে

গোছা গোছা চুল, যা আছে তাও প্রায় বোঁচা। সেই চুল প্রায় ঢেকে ফেলেছে মুখখানা। ঢেকেছে কতকগুলো জলজ্যান্ত চিহ্নও সেই সঙ্গে। চুল দিয়ে মুখ ঢাকা না থাকলে দাগগুলো দেখা যেত। ঠোঁটে গালে নাকে কপালে কামড়ানোর দাগ, ফুলে উঠেছে, দগদগে হোয়ে আছে। শেমিজ দিয়ে শরীরটা ঢাকা না থাকলে আরও বহু জাতের বহু চিহ্ন দেখা যেত। তা' দেখবার দরকার করে না, ওর চলন দেখেই ধারণা করা যায়, কি ঘটেছে ওর দেহের ওপর। তবু ও হাঁটছে, একমনে হেঁটে চলেছে ঘরখানার এধার থেকে ওধার। শব্দ হোচ্ছে—মচ্ মচ্ মচ্ মচ্, কাঠের মেঝে একটু একটু দুলছে। সেই দুলুনির সঙ্গে নারীর মনেও দোলা লাগছে। ভাবতে চেষ্টা করছে সে কি ছিল কি হোল। ভাবতে গিয়ে কোথাও একটু মিল খুঁজে পাচ্ছে না। সব গেল, চক্ষের নিমেষে খোল নলচে বিলকুল পালটে গেল। আর একবার কোনও মতেই সেই আগের খোল নলচেতে ফিরে যাওয়া যাবে না।

সেটা সম্ভব নয়। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে যা ছিল, তা' নেই। কি ছিল কি নেই! তার সেই দেহ রয়েছে, ঘষলে মাজলে যত্ন করলে রূপও ফিরে আসবে। টাকাকড়ি ধনদৌলত সমস্তই জমা আছে ঠিকঠাক যথাস্থানে, তা'হলে নেই কি। নেই কি ভাবতে গিয়ে কতকগুলো মুখ স্পষ্ট দেখতে লাগল চোখের সামনে, পনের ষোল বছরের ছেলে থেকে ষাট বছরের বুড়ো পর্যন্ত অন্ততঃ এক কুড়ি মানুষের মুখ। বেশীও হোতে পারে, শেষের দিকে সে হিসেব রাখেনি। চোখ বুজে ছিল, ভাবতে চেষ্টা করছিল অন্য কথা অন্য ঘটনা। শরীরটাকে নিয়ে তারা কামড়াকামড়ি করছিল, খেয়োখেয়ি করছিল, এক পাল কুকুর যেমন মরা গরু ছিঁড়ে খায়। চোখ বুজে থাকতে পারেননি, প্রত্যেকবার

তাকিয়ে দেখেছে নতুন নতুন মুখ। মানুষের মুখ বলে মনে হয়নি। মানুষের মুখ কি ঐ রকম হোতে পারে!

নিজের শরীরটাকে সে ভুলে থাকতে পারছে না। জ্বালা করছে, যন্ত্রণায় টনটন করছে শরীরের নানা জায়গায়, সেটাই আসল কথা নয়। আসল কথা হোল ঘৃণা। শরীরটাকে শত্রু বলে মনে হোচ্ছে। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে। কাপড় জামা তারা কেড়ে নিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা কিছুই ছিল না তার অঙ্গে, তারপর শেমিজটা জুটল। শেমিজটা যে দিল সে এক নারী। কয়েকটি নারী আগাগোড়া উপস্থিত ছিল, চোখ মেলে দেখেছে তারা। দেখেছে, আর একটা নারীদেহ নিয়ে এক :পাল হন্যে কুকুর কি করছে। দেখেছে আর স্ফূর্তিতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়েছে। ভয়ংকর মোটা চাকার মত মুখ একটা নারী বিবস্ত্রা হোয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তার ওপর। ভাবা যায় না, ভাবতে গেলে দিশাহারা হোয়ে পড়তে হয়। শরীরটার কথা সে ভুলে যেতে চায়, শরীরটাকে সে কোনওমতে পালটে ফেলতে চায়। শরীরটা পালটে ফেলতে পারলে সে বেঁচে যেত।

তারা আবার আসবে। তাদের পরামর্শ শুনে বোঝা গেছে যে তারা তাদের চাঁইদের ডাকতে গেছে। চাঁইরা এসে আমোদ স্ফূর্তি করবেন। চাঁইরা যদি এত বড় স্ফূর্তিটার ভাগ না পান, তা'হলে খেপে উঠবেন। তাই এরা লোভ সামলেছে। শেষ পর্যন্ত দলের কয়েকজন মুরুব্বী মেরে তাড়িয়েছে গোটাকতক ছোঁড়াকে। ছোঁড়াগুলোর আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। একজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার শরীরে ওপর, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সেটাকে টেনে তুলেছে। ঝগড়া মারামারি খেয়োখেয়ি চলেছে ওদের নিজেদের মধ্যে, সেই ফাঁকে কয়েক জনে তার শরীরটাকে নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে। উঃ, কি ভীষণ ক্ষিদে! কি বীভৎস

হ্যাংলাপনা। বাপ কাকা দাদা সব এসেছে একসঙ্গে, মা বোন খুড়ীরা দাঁড়িয়ে দেখেছে। অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো পর্যন্ত চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিল চতুর্দিকে, ছাগলের ছাল ছাড়ানো যেমন দেখে তেমনি দেখছিল। বাপ দাদা কাকা মামারা যা করছে, মা মাসীরা দাঁড়িয়ে যা দেখছে তা' অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আড়াল করবার ঢাকবার কোনও কারণ নেই। আবার তারা আসছে, আবার তারা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠবে। এই ফাঁকে শরীরটাকে যদি এমন অবস্থায় দাঁড় করানো যেত যে দেখলেই তাদের ভয় হয়, ভয় হয় বা ঘেন্না হয়, তা'হলে সব চেয়ে বড় প্রতিশোধ নেওয়া হোত। মুখের গ্রাস ফসকে গেলে কি অবস্থা হোত তাদের, দেখা যেত।

প্রতিশোধ!

প্রতিশোধ কথাটা মনে পড়তেই নারীর চলন বন্ধ হোল। স্থির হোয়ে দাঁড়াল সে, থুতনিটা বুকে ঠেকিয়ে ভাবতে লাগল।

খট্ খট্ আওয়াজ হোল বাইরে। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কারা যেন উঠে আসছে। চমকালো না নারীটি, চমকানো ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছে যেন। মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে ভয়ংকর দৃষ্টিতে দরজাটার পানে তাকিয়ে রইল।

"তোমার নাম কৃষ্ণা দস্তিদার?"

দস্তুরমত ভদ্র সাজপোশাক পরা আর এক নারী জিজ্ঞাসা করল। তার সঙ্গীটিও ভদ্র সাজপোশাক পরে এসেছে। পাজামা পাঞ্জাবি দিয়ে ঢেকেছে রোগা শরীরটা, অস্বাভাবিক লম্বা মুখে অস্বাভাবিক মোটা চশমা, মাথার ওপর কাকের বাসা। চুলগুলোতে তেল দেয় না বোধ হয় কখনও। মুখের কোণে

আটকানো আছে আধপোড়া সিগারেট। লোকটা ইংরেজী বলল—"ইরেলেভ্যান্ট কোয়েস্চন্, আসল কথা জিজ্ঞাসা কর কমরেড, হাতে বেশী সময় নেই।"

কমরেডটি নারী, কাজেই বাজে কথা কিছু বলবেনই। জিজ্ঞাসা করলেন আবার—"ঐ করুণাকেতন লোকটার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ ছিল?"

পুরুষ কমরেডটি বললেন—"ডাজ নট্ অ্যারাইজ। ক্যাপি-ট্যালিস্টদের মেয়েরা যা হয় তাই। হাঁ, আপনার কাছে আমি একটি প্রস্তাব করছি। আপনি এখনিই আপনার মুক্তি কিনে নিতে পারেন। আমি কাজের কথা বলছি। আপনার দাদা গোপিকারমণ দস্তিদার আপনার থ্রু দিয়ে ঐ দত্তটাকে হাত করেছিল। সে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল। আমরা জানতাম সে আমাদের কাজ করছে, আমরা তাকে রাশি রাশি টাকা দিয়েছি। আর ওধারে সে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পেরেছে, সমস্ত আপনার দাদাকে জানিয়েছে আপনার থ্রু দিয়ে। বলুন সত্যি কি না?'

কয়েকবার আপনি কথাটা শুনে কৃষ্ণা ভুল করে ফেললে। বলল—"আপনি ভদ্রলোক, উনি ভদ্রলোকের মেয়ে, আপনারা জানেন আমার উপর দিয়ে কি কাণ্ড হোয়ে গেছে?'

ভদ্রলোকের মেয়েটি বাঁকা হাসি হেসে বললেন—"ওতে দুঃখ করার কি আছে। ক্লাবে হোটেলে সাহেবদের সঙ্গে রোজ যা করে বেড়াও, এ তার রকমফের ছাড়া কিছু নয়। এরা গরীব, এরা শোষিত নির্যাতিত—সর্বহারা। এক দিন এরা একটু ভাল জিনিষের আস্বাদ পেলে। তুমিও বুঝতে পারলে, সব পুরুষই সমান।"

"আঃ, বক্তৃতা বন্ধ কর কমরেড"—বিরক্ত হোয়ে পুরুষ কমরেডটি

ধমক দিলেন। তারপর কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে খুবই মোলায়েম স্বরে বললেন—"বিরাট বিপ্লব এসে পড়েছে। আপনার মত অনেক মেয়েকেই এই ধরণের একটু আধটু আবদার সহ্য করতে হবে। যুগ যুগ ধরে এরা বঞ্চিত হোয়ে আছে কিনা। যাকগে, ও নিয়ে নিশ্চয়ই আপনি দুঃখ করছেন না। আফ্‌টার অল আপনার মত প্রোগ্রেসিভ মেয়েরা শরীরের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই খুঁতখুঁত করে না। ক্যাপিট্যালিষ্টরা সতীত্ব পবিত্রতা ঈশ্বর এই ধরনের কথাগুলো চালু করেছে বটে, কিন্তু ওরা নিজেরা ওসব বোগাস জিনিষ মানে না। ঐগুলোর দোহাই পেড়ে তারা তাদের শোষণ-কর্মটি চালায়। এনিওয়ে, আপনার জন্যে আমরা দুঃখিত, এখন বলুন, আমার প্রোপোজালটা সম্বন্ধে আপনি কি ঠিক করলেন। দত্ত আপনাকে কি কি ইনফরমেশন দিয়েছে তা' বলুন। আপনার দাদাকে আপনি কি কি জানিয়েছেন তা' স্পষ্ট করে বলুন। আপনার জন্যে যা করার আমরা করছি। ভাল বিশ্বাসী লোক সঙ্গে দিয়ে আপনাকে আপনার সেই কলকাতার ফ্লাটে পৌঁছে দোব।"

কৃষ্ণা মুখ ঘুরিয়ে নিলে, পেছনে ফিরে দাঁড়াল, তাদের পানে আর তাকালও না।

আরও কয়েকবার চেষ্টা করে পুরুষ কমরেডটি হাল ছেড়ে দিলেন। নারী কমরেডটি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—"এখনও তুমি তাদের হাতে পড়নি, তাই তোমার ডাঁট বজায় আছে। আমাদের দেশের চাষাভুষোরা তোমার ডাঁট ভাঙতে পারেনি। এবার যাদের হাতে পড়বে, তারা গরু মোষের চামড়া ছাড়িয়ে সেই চামড়া দিয়ে জুতো বানিয়ে কারবার করে। এক একজনের ওজন আড়াই মণ তিন মণ। তাদের দু'একজনের পাল্লায় পড়লে তখন বুঝবে—"

পুরুষ কমরেড আর একটি সিগারেট ধরিয়ে বললেন—"ত্থাট্‌স্ অল্। আমরা বিদেয় হচ্ছি। আপনার জন্যে আমরা দুঃখিত।"

তখন কৃষ্ণা বসে পড়ল।

বসে পড়বার পরে হুহু করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল ওর দু'চোখ থেকে, করুণাকেতনের মুখটা মনে পড়ে গেল। শেষবার যখন ও দেখেছিল করুণাকেতনকে তখন তার মুখখানা আর চেনা যায় না। নাকটা থেবড়ে গেছে, দুই ভুরুর ওপর থেকে চামড়া ঝুলে পড়ে দু'চোখ ঢেকে ফেলেছে, একটা কান নেই। তখন তার হুঁশ ছিল কি না বোঝা যায়নি। তারা তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তার সামনেই কৃষ্ণার গা থেকে জামা কাপড়গুলো ছিঁড়ে নিয়েছিল। করুণাকেতনের পায়ের কাছে ফেলে প্রথমে কয়েকজন তার শরীরটা নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছিল। তারপর তারা করুণাকেতনকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল। তখন ছেলে বুড়ো সবাই মিলে তাকে ছিঁড়ে খেতে লাগল। আর মেয়েগুলো বাচ্চাকাচ্চা কোলে করে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে।

কি হল তারপর করুণাকেতনের? কি করলে তাকে নিয়ে গিয়ে? কোথায় নিয়ে গেল?

বেশীক্ষণ করুণাকেতনের কথা ভাববার অবকাশ পেল না। আবার সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হোল। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলে, ঘরের মধ্যে দুই মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে। এক একজনের ওজন সত্যিই আড়াই মণ তিন মণ হবে।

ভয়ংকর দাঁত বার করে বীভৎস হাসি হাসছে তারা নিঃশব্দে।

চোখ তাদের নেই বললেই চলে, কপালের নীচে চোখের জায়গায় দুটো চেরা দাগ, তার ভেতর নীল আলো জ্বলছে। নাকও নেই বললেই চলে। চাকার মত থেবড়া মুখে শুধু সেই দাঁতের সারিই দেখল কৃষ্ণা। নিঃশব্দে তারা এগতে লাগল ওর পানে। আর সহ্য করতে পারলে না। 'বাবাগো' বলে একটা মর্মভেদী চিৎকার করে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

"শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত হানতে হবে।"

যশোদা বোঝাচ্ছিল যোগজীবনকে—"শত্রুর মর্মস্থান হোল তার পঞ্চম বাহিনী, এই দেশের লোক এই দেশে বসে আছে, কিন্তু সর্বনাশ করছে দেশের, শত্রুকে সব সংবাদ দিচ্ছে, কিংবা দেশের লোকের মন বিষিয়ে তুলছে। এই পঞ্চম বাহিনীকে ধ্বংস করা আমাদের ব্রত। এদের ধ্বংস করতে পারলে শত্রুর মর্মস্থানে আঘাত লাগবে। তারপর আর বেশীক্ষণ তাদের হাত পা চালাতে হবে না। আমাদের জোয়ানদের সামনে তারা ঠুঁটো হোয়ে পড়বে।"

যোগজীবন বললে—"আমাদের সরকারের কাজ এটা। সরকারের উচিত সর্বশক্তি প্রয়োগ করে শত্রুর গুপ্তচরদের উৎখাত করা। সরকার কেন তা' করছেন না ?"

"পারছেন না বলে"—যশোদা একেবারে উত্তাপহীন কণ্ঠে বলতে লাগল—"সরকারের শক্তি অসীম নয়। হাজার হাজার কর্মচারী দিয়ে সরকার তাঁর হুকুম কার্যে পরিণত করেন। হুকুমটা কাগজে লিখে ফেললেই হুকুমমত কাজ হয় না। যারা কাজ করবে, তাদের মধ্যে মজা লোটবার লোকই বেশী। পঞ্চম বাহিনী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও আছে। সব চেয়ে বড় কথা, দেশ যখন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত, তখন দেশের লোকের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে

দেশের সরকার কিছুই করতে পারেন না। আমরা ঠুঁটো নই, আমরা জানোয়ার নই, আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।"

"তা' নিশ্চয়ই আছে"—যোগজীবন সায় দিল। তারপর মিনমিন করে বললে—"অথচ সরকারের চক্ষে এ সমস্তই বেআইনী কাজ। আমাদের ধরতে পারলে সরকারও ছেড়ে কথা বলবে না।"

যশোদা সায় দিল—"নিশ্চয়ই, কিন্তু—"

কিন্তু পর্যন্ত বলে একটু ভেবে নিয়ে বললে—"ঘরে আগুন লাগলে নিভাতে চেষ্টা করাও বোধ হয় বেআইনী। যাকগে আইনের কথা, আইন আইনের বইতে লেখা আছে। আমরা জানি, আমরা বেআইনী কিছুই করছি না। আমাদের আশেপাশে আমাদের চতুর্দিকে ঘাঁটি পেতে বসেছে শত্রুর চর, সুযোগ পেলে সময় আসলে এরা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে। তখন সরকারের সেই আইনের বই খুলে চিৎকার করে পড়তে আরম্ভ করলে আমরা বাঁচব না। তাই বাঁচবার চেষ্টা করছি। আত্মরক্ষা করার অধিকার সবায়ের আছে। আমরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছি মাত্র, কোনও আইন আমাদের আত্মরক্ষার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।"

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল যোগজীবন। একটা রাইফেল হাতে আছে তার, সেটার কলকব্জা সম্বন্ধে যা কিছু জানার সব জেনে ফেলেছে। একটি বুলেট কি করতে পারে তাও জেনেছে। আধ ডজন বুলেট ফায়ারও করে ফেলেছে। ধাক্কা একটু লাগে বটে, কানের কাছেই বিদকুটে আওয়াজটা হয়। ওসব তেমন সাংঘাতিক ব্যাপার কিছু নয়। প্রথমবার ডান হাতের তর্জনীতে টান দিলে যে চমকটা লাগে, পরের বার সেটা থাকে না। যশোদাই মানতে বাধ্য হোয়েছে যে প্রথমবার ফায়ার করে যোগজীবনের মত স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। যশোদা আশা করে যে

দু'ডজন বুলেট খরচা হোতে না হোতেই যোগজীবনের লক্ষ্য স্থির হোয়ে যাবে।

লক্ষ্যটা করতে হবে কার ওপর!

তারই মত একটি মানুষের ওপর। তারপর সে মানুষটার গতি কি হবে তাও যশোদা বাৎলে দিয়েছে। বুলেটের অর্ধেকটা বারুদ, অর্ধেকটা শুধু সীসে ভরা আছে। পেন্সিলের চেয়ে সরু এক ইঞ্চি সীসে, রাইফেল নলের ভেতর দিয়ে তীব্রবেগে ঘুরতে ঘুরতে বেরবে। এমন ভয়ংকর তেতে উঠবে যে তখন যে কোনও জিনিস ভেদ করে বেরিয়ে যাবে। শরীরের যেখান দিয়ে ঢুকবে সেখানে ছোট একটি গর্ত হবে, বেরবে যেখান দিয়ে সেখানকার গর্তটা হবে বহুগুণ বড়। শরীরের মধ্যে ঢুকে কয়েক পাক দিয়ে মস্ত বড় একটা ছেদা করে বেরিয়ে যাবে।

"চমৎকার এফেকট্" যশোদা বলেছিল—"একটি মাত্র বুলেট ঠিক জায়গায় লাগাতে পারলে হাতিও ধরাশায়ী হয়। তবে মানুষ সহজে মরে না। গত মহাযুদ্ধে যত বুলেট ছোঁড়া হয়েছিল তার এক কোটি ভাগের এক ভাগ মানুষও যদি মরত তা'হলে পৃথিবী থেকে মানুষ জীবটাই লোপ পেত। অত বুলেট ছুঁড়লে এ পক্ষ ও পক্ষ, অথচ দেখুন দিব্যি আমরা জগৎ জুড়ে সবাই বাহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।"

"তা'হলে লাভ কি হবে বুলেট খরচা করে?" যোগজীবন জিজ্ঞাসা করেছিল।

"লাভ!" ভেবে চিন্তে যশোদা জবাব দিয়েছিল—"না, লাভ কিছু নেই। ওরা বুলেট চালাবে আর আমরা শুধুহাতে দাঁড়িয়ে থাকব, এটাতো হতে পারে না। বাধ্য হয়ে আমাদের জবাব দিতে হবে। বুলেটের জবাব বুলেট দিয়ে দিতে হয়, এই লাভ।"

তবু সেই উৎকট প্রশ্নটাই খাড়া হোয়ে রইল সামনে। প্রশ্নটি

হোল, লক্ষ্য স্থির করতে হবে একটি মানুষের ওপর। সে মানুষটি কে! সে আমার কি করেছে! কেন আমি তার মর্মস্থলে আঘাত হানতে যাব।

অকস্মাৎ প্রশ্নটি সরে গেল সামনে থেকে, লক্ষ্য স্থির হোয়ে গেল যোগজীবনের। শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসবার পরে যার ওপর নিশানা করে রাইফেল চালাতে হবে তাকে—সেই দুশমনকে অহর্নিশ চোখের সামনে দেখতে লাগল।

দস্তিদার সাহেব সংবাদ পাঠালেন, কোথা থেকে সংবাদ পাঠালেন তা জানা গেল না, সংবাদটি কিন্তু এসে পৌঁছল। যশোদা বললে —"ভোরবেলা আমরা বেরচ্ছি। বাবা খবর পাঠিয়েছে, শিলিগুড়িতে গিয়ে আমাদের একটা মড়া দেখে আসতে হবে। যেতে হবে পুলিসের সঙ্গে, পুলিস সাহেব সঙ্গে যাবেন। আপনি সেই মড়াটাকে দেখবেন, যেখে যদি চিনতে পারেন চিনবেন। একটি কথাও কিন্তু পুলিসকে বলতে পারবেন না। বলে দেবেন, চিনতে পারলাম না। পুলিস আপনার নাম ধাম পেশা জিজ্ঞাসা করতে পারে। নাম ঠিকানা ঠিকঠাক বলবেন। বলবেন, চার পাঁচ বছর দস্তিদার সাহেবের কাছে আছেন। বলবেন, আপনি আমাকে পড়ান। দস্তিদার সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী বললেই বা মন্দ কি। আর কিছু বলবেন না। পুলিস হয়তো আমার সামনে বেশী কিছু আপনাকে জিজ্ঞাসাও করবে না।"

যোগজীবন বললে—"আপনি আমার ছাত্রী! বাঃ বেশ!"

যশোদা জবাব দিল—"ছাত্রীই তো। একশ'বার ছাত্রী। আপনাকে যত দেখছি তত শিখছি।"

"কি শিখছেন?"

"অল্প কথা বলা, মুখ টিপে থাকা, সব রকম অবস্থার মধ্যে পড়েও এতটুকু বিচলিত না হওয়া, এই তিনটি জিনিস।"

যোগজীবন মুখ টিপেই রইল। তোড়জোড় শুরু হোল পুলিসের সঙ্গে যাবার। সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়ের তৈরী কালো রঙের কোট প্যাণ্ট, ভয়ানক দামী কাপড়ের সার্ট, জুতো মোজা, বিলকুল বার করে আনলে যশোদা। আর একবার আশ্চর্য হোল যোগজীবন, তার শরীরের মাপ পেলে কি করে এরা! জুতো পর্যন্ত ঠিকঠাক পায়ে লেগে গেল। নেক্‌টাইতে কেমন করে ফাঁস দিতে হয় তা' শিখিয়ে দিলে যশোদা। বললে—"ভোরবেলা আমি নিজে বেঁধে দোব। আপনি বরং এই টাইটা নিয়ে ফাঁস দেওয়া প্র্যাক্‌টিস্ করুন। যাবার আগে আর একটা টাই আমি বেঁধে দোব।"

রাত ছুটোর সময় উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে পোশাক পরিচ্ছদ পরে আয়নায় নিজেকে দেখে লজ্জিত হোয়ে পড়ল যোগজীবন। সত্যিই লজ্জিত হোয়ে পড়ল। এর চেয়ে সেই নোংরা জামা কাপড় পাগড়ি পরে বেশ আরাম বোধ করেছিল। এ আবার কি হোল!

ভয়ংকর রকম মানিয়ে গেছে তাকে ঐ পোশাকে। চিরকাল যেন সে ঐ জাতের দামী পোশাক পরেই কাটিয়েছে। যোগজীবন রায়, যার বাড়িতে মা ভাই বোন এক বেলা খেতে পায় এক বেলা উপোষ করে, সেই যোগজীবন কোথায় লুকাল! সেই হাবাতে চেহারা পালটে গেল যে একেবারে! ইনি আবার কোথাকার কোন প্রিন্স উপস্থিত হোলেন!

দামী ফেল্টের টুপি, একটা রিস্টওয়াচ, ছুটো পাথরবসানো আংটি নিয়ে যশোদা উপস্থিত হোল। বললে—"নিন মাস্টার মশাই, পরে ফেলুন এগুলো। ঐ যে টাইটাও বেঁধেছেন দেখছি। দেখি দেখি, না খুঁত নেই। আর এই নিন আপনার পার্স, এই

হোল সিগারেট কেস, এই নিন লাইটার, আর এই চশমা। গাড়িতে ওঠবার আগে চশমা আর টুপি লাগিয়ে নেবেন। গাড়িতে উঠে সিগারেট বার করে ধরাবেন। একফাঁকে পার্সটা বার করে টাকাগুলো একটু দেখাবেন। ধরুন, আপনার ছাত্রীকে একটা লিমনেড কিনে দিলেন। পুলিসের লোকদেরও লিমনেড খাইয়ে দিলেন। পরোয়া নেই, ঐ চেহারা ঐ সাজপোশাক আর পার্সবোঝাই টাকা। দস্তিদার সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী, দিব্যি মানিয়েছে, বাঃ!"

যোগজীবনও তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে থাকার মত সাজ-পোশাক পরেছে তার ছাত্রী। শহর কলকাতার মহাসম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েও মানানসই সাজপোশাক মানানসই করে পরা কর্মটি তার ছাত্রীর কাছে শিখে নিতে পারে।

ভোরবেলা নয়, রোদ উঠেছে তখন, পুলিস সাহেব উপস্থিত হোলেন। পুলিসের গাড়িতে গিয়ে ওরা উঠল। ছোটখাট একখানা বাস বললেও চলে। ন' দশ জন মানুষ আরামে বসে যেতে পারে। রাইফেল হাতে নিয়ে দুজন সেপাই বসে আছে গাড়িতে। আর একজন অফিসার রয়েছেন, তাঁর কোমরে ঝুলছে চামড়ার খাপ, খাপ থেকে রিভলভারের বাঁট উঁকি মারছে। পুলিস সাহেবের কাছে অস্ত্র নেই। ওদের নিয়ে তিনি বসলেন মাঝের সীটে, পেছনে সেপাই দুজন রইল। ড্রাইভারের পাশে বসলেন অফিসারটি, গাড়ি ছাড়ল।

হাঁ, চিনতে পারলে যোগজীবন, দস্তুরমত চিনতে পারলে। ঐ চুল ঐ কপাল রঙ গড়ন কিছুতেই ভুল হবার নয়। ডান হাতে অনামিকার মাথায় কালো তিলটি পর্যন্ত ঠিক আছে। কপালের নীচে থেকে থুতনি পর্যন্ত থেঁতলে খাবলে উপড়ে নেওয়া হোয়েছে, দাঁত একখানি নেই। গুলি করেছিল পিঠে, বুকের ওপর মস্ত বড়

এক ছেঁদা। বুলেটের ক্ষমতা যোগজীবনের মনে পড়ে গেল। রঙিন চশমাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল দেহটার পানে যোগজীবন। তারপর চশমাটা চোখে এঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে অফিসারটি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও বেরিয়ে এলেন। গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছিলেন পুলিস সাহেব, যশোদা গাড়ি থেকে নামেনি। সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হোল? শুধু শুধু কষ্ট দেওয়া হোল তো আপনাদের?"

যোগজীবন পালটা প্রশ্ন করল—"ঐ লোকটিকে কি খুন করা হোয়েছে?"

"আপনার কি মনে হোল বলুন।"

"আমার মনে হোল, যারা ওকে খুন করেছে তাদের যদি খুঁজে বার করতে পারতাম—"

"সেই কর্মটি তো আমরাও করতে চাই। আপনার চেনাজানা কোনও লোকের সঙ্গে ওর কোনও মিল দেখলেন?"

"চিনতে যদি পারতাম ওকে, তা'হলে জীবন পণ করে ওর শত্রুদের খুঁজে বার করতাম। তারপর তাদের প্রত্যেককে ফাঁসিতে লটকাতাম।"

সাহেব আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না তখন। গাড়ী ফিরল।

হঠাৎ যোগজীবনের মনে হোল পার্স টা দেখাতে হবে। পার্স টা বার করল সে পকেট থেকে, যশোদার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললে—"দেখ ত ডলি, ওতে কত আছে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল যশোদা। বললে—"কেন, কি হবে?"

"দেখই না।"

যশোদা সব ক খানা নোট বার করে গুনে বলল—"এ যে অনেক টাকা—তিনশ'র কিছু বেশী—"

মুখ না ফিরিয়ে যোগজীবন বললে—"ওঁকে দাও। আমি চাই, ঐ লোকটার ফোটো তুলে সমস্ত কাগজে ছাপিয়ে দেওয়া হোক। ঐ টাকায় যদি না কুলোয় আরও আমি পাঠিয়ে দোব।"

সাহেব বললেন—"টাকা আপনাকে দিতে হবে না। দরকার হোলে আমরাই তা করব। আপাততঃ তার দরকার করছে না। যিনি মারা গেছেন বলে আমরা সন্দেহ করছি, তার নামটা এখন প্রকাশ করতে চাই না। তাতে অপরাধীদের সুবিধে হবে।

"কে খুন হোয়েছে বলে মনে করছেন আপনারা?" যশোদা প্রশ্ন করল।

যশোদার কথাটা যেন শুনতেই পেলেন না পুলিশ সাহেব। যোগজীবনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মিষ্টার কে. কে. দত্তকে আপনি চেনেন?"

"কে. কে. দত্ত!" যোগজীবন আকাশ থেকে পড়ল।

যশোদা বলল—"বাঃ, পিসেমশাইকে চেনেন না আপনি! আমার পিসেমশাই করুণাকেতন দত্ত—"

যোগজীবন খাড়া হোয়ে বসে বললে—"নিশ্চয়ই চিনি। কে. কে. দত্ত বলার দরুন ঠিক—"

পুলিস সাহেব জানলার বাইরে তাকিয়ে বললেন—"এখন ভেবে দেখুন, মিস্টার দত্তর সঙ্গে কোনও মিল আছে কি না। মিস্টার দস্তিদার জানিয়েছেন যে, যদি ঐ দেহটা দত্ত সাহেবের হয়, তা'হলে নিশ্চয়ই আপনি চিনতে পারবেন। আপনি নাকি অনেকদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন।"

যোগজীবন প্রায় চিৎকার করে উঠল—"ইম্‌পসিব্‌ল্‌, অ্যাব্‌সার্ড, তাঁর মত মানুষ—"

"আজকের দিনে ইম্‌পসিব্‌ল্‌ বলে কোনও কথা নেই।" সাহেব গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যেই যেন বললেন—"যেতে দিন খুনখারাপির কথা। আপনাদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হোল। যাক, একটা ব্যাপার ঠিকই যে ঐ দেহটা আপনি সনাক্ত করতে পারলেন না। এই খবরটা মিস্টার দস্তিদারকে জানিয়ে দিতে হবে।"

বাঙলোর সামনে ওদের নামিয়ে দিয়েই পুলিস সাহেব বিদায় হোলেন। তাঁর অনেক কাজ, আর এক দিন আসবেন যখন মিস্টার দস্তিদার থাকবেন।

পুলিসের গাড়ি বেরিয়ে যাবার পরে যোগজীবন বললে—"আর পারা যায় না!"

আশ্চর্য হোয়ে চোখ তুলে তাকাল যশোদা, সত্যিই যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে লোকটা ভেঙে পড়েছে। কি হোল! যশোদা বলল—"এইবার ঐ পোশাকগুলো ছেড়ে কিছু খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করুন তা'হলেই—"

আপনমনে যোগজীবন বলতে লাগল—"এই অভিনয়, এই বিড়ম্বনা ভোগ, এই বেঁচে থাকার জন্যে আকুলিবিকুলি, এ সবের মেয়াদ কতটুকু! ঐ তো মরে পড়ে আছেন সাহেব, সেই মুখ সেই চোখ সেই রূপ কোথায় গেল!"

প্রায় দমআটকানো অবস্থায় বলে উঠল যশোদা—"তার মানে। আপনি চিনতে পেরেছেন?"

যোগজীবনকে জবাব দিতে হোল না। নেপালী বেয়ারা সামনে এসে লম্বা সেলাম দিয়ে বললে—"সাহেব আপনাকে ডাকছেন। কিতাব ঘরে তিনি বসে আছেন।"

কিতাব ঘরটি অন্ধকার। সেটি বাঙলোর নীচে মাটির তলায় বললেও চলে। দস্তিদার সাহেবের শোবার ঘর থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সেই ঘরে, সেই পথে ছাড়া কিতাব ঘরে যাওয়া আসার উপায় নেই। ঘরটি সদা-সর্বক্ষণ অন্ধকার, দিনের বেলায় আলো জ্বালাতে হয়। ঘরের চার দেওয়াল দেখা যায় না, দেখা যায় শুধু বই। দস্তিদার সাহেব সেই ঘরে না থাকলে তাঁর মেয়েও সেখানে যেতে পারে না। দরজায় চাবি বন্ধ থাকে।

তরতর করে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল যশোদা, যোগজীবন সন্তর্পনে নামতে লাগল। শুনতে পেল, যশোদা বলছে—"জানলে বাবা, ভয়ংকর ব্যাপার। মিস্টার রায় চিনতে পেরেছেন।"

সেই শ্রান্ত ক্লান্ত আধঘুমন্ত স্বর শোনা গেল—"জানতাম পারবে। কোথায় সে, তাকেও এখানে নিয়ে আয়।"

যোগজীবনের পা তখন কিতাব ঘরের মেঝে স্পর্শ করেছে। সাড়া দিল সে—"এই যে আমি।"

দস্তিদার বললেন—"এস, বস ঐখানে। তুমি যে চিনতে পেরেছ, এটা পুলিশ ধরতে পারেনি তো ?

যশোদা বললে—"আমিই পারিনি। উঃ, কি সাংঘাতিক মানুষ, কি ভয়ংকর অভিনয় করতে পারেন। আর একটু হলে আমিই একটা যা তা কাণ্ড করে বসতাম। হঠাৎ বললেন—দেখ তো ডলি ওতে কত টাকা আছে। ডলি আবার কে রে বাপু! এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলুম—"

দস্তিদার অল্প একটু হাসলেন। যোগজীবন মুখ নুইয়ে রইল। গলগল করে যশোদা আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা বলে গেল। ও থামতে যোগজীবন জিজ্ঞাসা করল—"কারা ওকে খুন করেছে!"

"খানিক পরেই তা' জানতে পারব বলে আশা করছি।" জবাবটি দিয়ে মেয়ের পানে তাকিয়ে বললেন—"তারপর তোকে টোপ হিসেবে কাজে লাগাব। উৎকৃষ্ট টোপ, যারা আমার বোনটাকে নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠেছে, তারা আমার মেয়ের লোভ সামলাতে পারবে না। চুনো পুটি রাঘববোয়াল কে কতখানি জলের তলায় বাস করছেন এবার তা' বোঝা যাবে।"

একটি একটি অক্ষর আলাদা করে উচ্চারণ করল যোগজীবন—"তা-র-প-র ?"

চোখ বুজে ফেলেছেন তখন দস্তিদার, বললেন—"তারপর তোমরা আছ। তুমি আর তোমার মত কয়েকটি ছেলে মেয়ে। তোমরা জান, তারপর কি হবে, কি করবে তোমরা। আমি তারপর ছুটি নোব, আর পারা যায় না।"

ঐ কথাটাই আর এক ভাবে বললেন সেদিন এক দেশবিখ্যাত সাহিত্যিক, ঐ ছুটি নেবার কথা। মস্ত এক সভা হচ্ছে, বিদেশী শত্রু আক্রমণ করেছে দেশ, এখন দেশের মানুষেরা কি ভাবছে তাই তিনি মারপ্যাঁচহীন ভাষায় অকপটে ব্যক্ত করছিলেন। তিনি বলছিলেন—"এত বড় এই দেশটায় আমরা চল্লিশ কোটি মানুষ বাস করি। আমরা চল্লিশ কোটি, আমাদের মধ্যে চল্লিশ হাজার মানুষও রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমরা খাটি খাই ট্যাক্স গুনি। আমরা আশা করেছিলাম যে, দেশ স্বাধীন হবার পরে স্বাধীন দেশের বুকে স্বাধীন আকাশের তলায় যারা জন্মেছে, তারা বিশ বছরে পা দিক, তাদের ভোট দেবার অধিকার জন্মাক, তারা তাদের নিজেদের মনের মত সরকার তৈরী করুক, সেই সরকার যেমন খুশি আইন বানিয়ে পুরনো বিধিবিধান পালটে

দিক, সেই সরকার নতুন সমাজ ব্যবস্থা চালু করুক। মাত্র কুড়িটা বছর, দেশ স্বাধীন হবার পরে যারা এই দেশে জন্মেছে তারা পনরোয় পৌঁছল, আর মাত্র কয়েকটা বছর কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়া, যতদিন না এই স্বাধীন দেশে জন্মানো মানুষগুলো নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হাতে নিচ্ছে, ততদিন একটা ভাঙা গড়া, বিরাট কোনও পরিবর্তন, যে পরিবর্তন ধ্বংসের ধ্বজা উড়িয়ে রক্তভেজা পিছল পথে ছাড়া আসবে না, তেমন কিছু আমরা ঘটাতে চাইনি। ওদের মুখপানে তাকিয়ে দিন গুনছি আমরা, খাটছি খাচ্ছি ট্যাক্স গুনছি। আমাদের ছুটি পাবার দিন এসে পড়েছে। আর পাঁচটা বছর যদি আমরা কোনওরকমে দেশের স্বাধীনতাটুকু বজায় রেখে কাজ চালিয়ে নিতে পারি, তা'হলে আমরা ছুটি পাব। ওরা ওদের নিজেদের ভার নিজেরা নেবার জন্যে তৈরী হোয়ে উঠেছে, পনরো পার হতে চলল; আর ভয় কি। ওরা নিঃশঙ্ক চিত্তে ভাঙবে, ওরা নির্দয় ভাবে গড়ে তুলবে, ওরা আমাদের মত থতমত খাবে না। ওদের তেজ ওদের শক্তি আমরা পাব কোথায়, আমরা যে পরাধীন অবস্থায় জন্মেছি, আমাদের রক্তে যে সেই বিষ রয়ে গেছে।

আমাদের আশায় ছাই দেবার জন্যে ওধারে ওঁরা তৈরী হোয়েছেন তলে তলে, আমরা টেরও পাইনি। ঐ ওঁরা, আমাদের মধ্যে যাঁরা চল্লিশ হাজারও নয়, যাঁরা রাজনীতি ব্যাপারটা বোঝেন, যাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বুদ্ধিমান, দেশটার ভালমন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে যাঁরা একচেটিয়া রাজনীতির কারবার ফেঁদে বসেছেন, রাজনীতি করে যাঁরা নিজেদের পেট চালান,—পেট চালান, ব্যাঙ্কে টাকা জমান, মোটর গাড়ি হাওয়াই জাহাজে ঘুরে বেড়ান যাঁরা, সেই সমস্ত ভেরি ইম্‌পর্ট্যান্ট পার্স‌ন্‌স্‌ ভিপেরা বন্দোবস্ত করে বসে আছেন

আমাদের এই এত বড় দেশটাকে আর একবার বিদেশী চামারের কাছে বিকিয়ে দেবার। অকস্মাৎ আমরা জানতে পারলাম, আমাদের মাথার মণি অতবড় হিমালয়টাই বেমালুম গ্রাস করে ফেলেছে শত্রু। হিমালয় পার হোয়ে শত্রু আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

কি করে এত বড় ব্যাপারটা ঘটল! এত বড় ব্যাপারটা তো রাতারাতি ঘটেনি! তোমরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমচ্ছিলে?

আমরা চল্লিশ কোটি প্রাণপণে খাটছি, ট্যাক্স গুনছি কড়ায় গণ্ডায়, তোমরা পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা করছ, দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত হরদম চষে বেড়াচ্ছ হাওয়াই জাহাজে চড়ে, বড় বড় দূত মহাদূত উপদূত বসিয়ে রেখেছ দুনিয়াময়, দুনিয়ার বড় বড় ঝগড়াঝাঁটি মিটিয়ে দিচ্ছ মাঝখানে পড়ে, কত কি কেরামতি দেখাচ্ছ দুনিয়াময়, আর অত বড় হিমালয়টা গ্রাস করে বসল বিদেশী চামাররা, মোটেই টের পেলে না? আমাদের ভাল মন্দের ভার তোমাদের কাছে জিম্মা দিয়েছি, আমরা শুধু খেটে চলেছি আর তোমাদের খরচ চালাচ্ছি, তার পরিণাম হোল এই! আমাদের ঐ পনরো বছরের ছেলে মেয়েগুলোর চোখের আলো নিভে যাবার উপক্রম হোল! আমাদের আশায় তোমরা ছাই দিলে!

চক্ষের নিমেষে আমরা চল্লিশ কোটি এক হোয়ে গেলাম। কন্যাকুমারী থেকে কচ্ছ, কচ্ছ থেকে কুমায়ুন, কুমায়ুন থেকে কাকদ্বীপ, কাকদ্বীপ থেকে কন্যাকুমারী, এই মাটিতে যেখানে যে বাস করছে, সে যে ভাষাতেই কথা বলুক বা যে ধর্মই মানুক, কিছু যায় আসে না। আমাদের শরীরের মধ্যে আমাদের শিরা-উপশিরায় যে রক্ত বইছে তা' হোল এই বিশাল মাটির রক্ত। এই মাটিতে জন্মে এই মাটিতে বড় হোয়ে এই মাটির বুকের দুধ পান করে আমরা

বেঁচে আছি। আমাদের পরিচয় এই মাটি। আমাদের মধ্যে ভেদ নেই বিভেদ নেই। আমরা এক, আমরা অবিচ্ছিন্ন অবিভাজ্য। আমাদের চল্লিশ কোটি অন্তরের অন্তর থেকে চল্লিশ কোটি বজ্র একসঙ্গে গর্জে উঠল—'জয় হিন্দ্'। সেই মহা হুংকার হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়া স্পর্শ করল, সেই মহানাদ হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে ঘুরপাক খেতে লাগল। চর্মশিল্পীর জাত কেঁপে উঠল, ওরা কল্পনাও করতে পারেনি যে শতধাবিভক্ত ভারত মুহূর্ত মধ্যে জেগে উঠবে। ওরা জানত, শান্তির বিষবড়ি খেয়ে আমরা চল্লিশ কোটি ঢুলছি, ওরা মনে করেছিল আমরা শুধু সাদা পায়রা ওড়াতেই জানি, ওদের বোঝান হোয়েছিল আমরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করা ছাড়া আর কিছুই জানি না।

কারা তাদের বুঝিয়েছিল ঐসব ব্যাপার?

আছে, তারা আমাদের মধ্যেই আছে। আমাদের এই মাটিতেই জন্মেছে তারা, এই মাটির বুকের রক্ত পান করে আমাদের মতই তারা বড় হোয়েছে। এই দেশের আলো বাতাস এই দেশের জল তাদেরও বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু তারা এ দেশের মানুষ নয়। কোনও ঋণ নেই তাদের এ দেশের জল হাওয়া আকাশ মাটির কাছে। তারা যাদের নুন খায় তাদের গুণ গায়।

তারাও ভিপ্, তারাও ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পার্সনস্, তারা আরও ভাল রাজনীতি বোঝে। তারা আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে মুক্তিফৌজকে ডেকে নিয়ে এসেছে।"

এই পর্যন্ত বলে বক্তা একবার থামলেন। দেখে নিলেন চারিদিকে তাকিয়ে, সভায় কোনওরকম চাঞ্চল্য ফুটে উঠল কি না। তারপর আবার শুরু করলেন।

"আমাদের এক দিকে এঁরা—ঐ বড় তরফের ভিপেরা, আর এক দিকে ওঁরা—ওই ছোট তরফের ছোট জাতের ভিপেরা, এঁরা

আর ওঁরা বোঝেন রাজনীতি, ওনারাই আমাদের ভাল মন্দ নিয়ে মাথা ঘামান। এঁরা আমাদের শুনিয়েছেন সাদা পায়রার মাহাত্ম্য, বলেছেন—পশ্য পশ্য, দুনিয়াময় সাদা পায়রা উড়িয়ে কেমন কেরামতি আমরা দেখাচ্ছি তা' আঁখি মেলি পশ্য। আর কান পেতে শোন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আমাদের নামে বাহবাধ্বনি উঠেছে কি না। 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী ষোল দু'গুণে বত্রিশ আনা ফলিয়ে ছেড়েছি কি না আমরা, তাই আগে বল। কলের মত কল বানিয়েছি আমরা—প্রটোকল। প্রটোকলের প্যাঁচে পড়ে আমাদের পালাম বিমান বন্দরে নেমে বাঘে গরুতে এক গামলা থেকে জাবনা খাচ্ছে। অহিংসার মহিমাকে কুর্নিশ ঠোকবার জন্যে তেড়ে গিয়ে এক গাদা ফুলের মালা ফেলে আসছে যমুনাপাড়ের সেই বেদিটার ওপর। বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হোয়ে নামছে যখন দমদমে তখন সর্বাগ্রে ছুটে যাচ্ছে জোড়াসাঁকোর সেই ঘরখানায়। সমস্তই হোল প্রটোকলের প্যাঁচ, কলের মত কল প্রটোকল বানিয়ে ছেড়েছি স্বাধীন হোতে না হোতেই। আর কি চাও, আমাদের ওপর আস্থা রেখে খাটো খাও আর খরচা যুগিয়ে যাও। খরচাটা যোগালেই হোল, সাদা পায়রা পুষতে খরচা লাগে তো।

সাদা পায়রার পিঠে চেপে আমাদের বড় তরফ চিত্তসুখে উড়ছিলেন আকাশে। জানতেন না ভদ্রমহোদয়গণ যে আকাশে চিল আছে শকুন আছে শিকারী বাজ আছে। জানতেন না তাঁরা যে তাঁদের পায়ের তলায় মাটির বুকে গোখরো সাপও ঘুরে বেড়ায়। আহা—বাছারা! বাছারা এখন পরিত্রাহি চিৎকার জুড়েছেন, আমাদের মত সাদা ভাষায় কথা বলছেন এখন তাঁরা। বলছেন—'রক্ষে কর, বাঁচাও, ঐ উড়ে আসছে শকুনি গৃধিনীর পাল, ওরা আমাদের রক্ত মাংস হাড় সব খাবে, আমাদের সাদা পায়রাকেও

রেহাই দেবে না। এখন তোমরা চল্লিশ কোটি যদি আমাদের না বাঁচাও কে বাঁচাবে।'

এঁরা কিন্তু এখনও চেষ্টা করছেন আমাদের পায়ে দংশন করবার। ছোট তরফের এঁরা, যাঁরা প্রটোকল বানাননি, বানিয়েছিলেন গেঁড়াকল, শকুনি গৃধিনী বাজের কাছ থেকে যাঁরা রাশি রাশি টাকা খেয়েছেন আর আমাদের বুঝিয়েছেন যে সাম্যবাদ এসে পড়েছে, বড় লোক গরীব লোক বলে কোনও কিছু থাকবে না, শোষণ থাকবে না, অত্যাচার থাকবে না, সর্বহারারা সর্বস্বওয়ালা সর্বেশ্বরদের পায়ের তলায় ফেলে মনের সুখে লাথি মারতে পারবে, সেই ছোট তরফ বলছেন এখনও যে, সাম্যবাদীরা কখনও পরের দেশ আক্রমণ করে না, ওরা শুধু সীমানা ঠিকঠাক করে নেবার জন্যে এসে পড়েছে। চল্লিশ কোটি মানুষের মধ্যে ওরা কত জন? বিদেশী শত্রু আক্রমণ করেছে বলে ওরা সুখী। ওদের বিদেশী মনিবরা ওদের বছরের পর বছর টাকা গুনেছে আমাদের ভুল বোঝাবার জন্যে। এখনও ওরা সেই বিদেশী মনিবের গুণগান করছে, বিষ প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছে আমাদের মর্মস্থলে। খেতে খামারে কলে কারখানায় ওরা বলে বেড়াচ্ছে, মুক্তিফৌজ এসে পড়েছে, মুক্তিফৌজকে অভ্যর্থনা করার জন্যে তৈরী হোয়ে থাক।

আমরা চল্লিশ কোটি। আমাদের মধ্যে ওই গেঁড়াকলওয়ালারা কতজন? আমরা ওদের ধরে ধরে বিষদাঁত উপড়ে ফেলতে পারব না? এত বড় স্পর্ধা ঐ বিদেশী চামারদের পা চাটা কুকুরদের যে ওরা এখনও আমাদের মধ্যে বাস করে আমাদের সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে?"

ক্ষোভে দুঃখে বক্তার গলার স্বর ভেঙে পড়ল। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে বোধ হয় তিনি দম নিতে লাগলেন।

হঠাৎ একটা রৈ রৈ শব্দ উঠল সভার এক পাশ থেকে;

কয়েকখানা আধলা ইঁট এসে পড়ল বক্তার টেবিলের ওপর। মেয়েরা বসেছিলেন সামনে, তাঁরা চেঁচামেচি করতে লাগলেন। একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হোল। চিৎকার আর্তনাদ সোডার বোতল ফাটবার আওয়াজ সমস্ত মিলে মিশে একাকার হোয়ে গেল। দূর থেকে তার টেনে এনে বাতি জ্বালানো হোয়েছিল, সেই তার ছিঁড়ে গেল, বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে তখন কে কাকে দেখে! গলা ফাটিয়ে বক্তা চেঁচাতে লাগলেন—"মেয়েরা বসে পড়ুন, মায়েরা এক পা নড়বেন না।" পুলিসের হুইসিল শোনা যেতে লাগল। চারটি মাত্র পুলিস ছিল সভায়, সে বেচারারা কি করবে। তারপর শোনা গেল কয়েকখানা লরি বিকট গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। সব কখানা লরি মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল রাস্তার ওপর। ভয়ংকর জোরালো আলোয় অন্ধকার ঘুচে গিয়ে দিন হোয়ে গেল। দাড়ি পাগড়ি কৃপাণওয়ালা কয়েকজন শিখ ভদ্রলোক ঝাঁপিয়ে পড়লেন জনতার মধ্যে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা মেয়েদের জন্যে পথ করে দিলেন। মেয়েরা আগে উঠে গেলেন রাস্তায়, তারপর পুরুষরা যেতে পেলেন। ইতিমধ্যে আবার জ্বলে উঠল আলো। তখন দেখা গেল, কয়েকজনের মাথায় চোট লেগেছে, ভিড়ের মধ্যে পড়ে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতির ফলে কয়েকজন থেতলে গেছেন। এবং তিনটি লোক পড়ে আছে এক ধারে, তাদের প্রত্যেকের টুটি কাটা। লোক তিনটিকে অনেকেই চিনতে পারল। ওঁরা চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে চাঁদা তুলে বেড়ান।

সদলবলে পুলিস এসে হাজির হোল। সাড়ম্বরে শুরু হোয়ে গেল অনুসন্ধান পর্ব, সভার উদ্যোক্তাদের নিয়ে পুলিস উঠে পড়ে লাগল রিপোর্টটা ঠিকঠাক খাড়া করতে। তিন তিনটে মানুষ খুন হোয়েছে, চাট্টিখানি কথা নয়।

ওধারে লরিসুদ্ধ শিখ ভদ্রমহোদয়গণ অন্তর্ধান করলেন।

পুলিসের খাতায় তাঁদের নাম ধাম পরিচয় কিছুই লেখা হোল না।

পরিচয় চেহারাতেই লেখা রয়েছে। কাউকে চিনিয়ে দিতে হবে না যে উনিই ধর্মগুরু, উনিই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কোমর পর্যন্ত লম্বা সাদা দাড়ি, দীর্ঘ দেহখানি ধনুকের মত বাঁকা, মাথায় এলোমেলো করে জড়ানো জাফরানী রঙের একখানি সিল্কের কাপড়, তার তলা থেকে সাদা চুলগুলি নেমে দু'কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে, পরে আছেন হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটি দুধের মত সাদা জামা, বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়ে ডান কোমরের তলায় নেমেছে দু'ইঞ্চি চওড়া একটি ফিতে, সেই ফিতের দু'মাথা যেখানে মিলেছে সেখানে ঝুলছে বহুমূল্য খাপে ভরা লম্বা একখানি কৃপাণ, আসল বাদসাহী সাজ। হাঁটু মুড়ে কয়েকটি চেলা বসে আছেন, দাড়ি পাগড়ি কৃপাণ দিয়ে সাজানো তাঁদের গুরুগম্ভীর চেহারাগুলি। চেলাদের বাসবার ভঙ্গী চোখের স্থির দৃষ্টি আর গুরুদেবের নিঃশব্দ পদচারণ নিঃশব্দে ঘোষণা করছে যে গুরুতর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অদৃশ্য ভাবে পাক খাচ্ছে যেন কয়েকটি চরম কথা ছোট্ট গুরুদ্বারটির মধ্যে, যে কোনও মুহূর্তে সেগুলো সাকার রূপ ধারণ করতে পারে।

অবশেষে সেই দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ মুখ খুললেন।

"বাচ্চার ছেলে যদি প্রতিশোধ নিতে চায়, নিতে পারে। তার বাপকে যারা খুন করেছে, তাদের খুনে বাচ্চার ছেলে নিজের কৃপাণ রাঙা করুক, এই হোল ধর্মের নির্দেশ।"

নির্দেশ শুনে শ্রোতারা নিজের নিজের কৃপাণ স্পর্শ করে হাত কপালে ঠেকাল। বৃদ্ধ গুরু জিজ্ঞাসা করলেন—"যাদের ধরে আনা হোয়েছে, তারাই যে দোষী, এ বিষয়ে তোমাদের সন্দেহ নেই তো?"

প্রায় প্রৌঢ় এবং সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ যিনি তিনি জবাব দিলেন—"ওঁদের একজন কবুল করেছে।"

"সে যে সত্যি কথা বলেছে, তার প্রমাণ পেয়েছে ?"

"প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে বাঙালী বাবুটি গাড়ি কিনে বাচ্চা সিংকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর দেহটা পুলিসের হেপাজতে আছে। পুলিস সেটা খাদের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে গেছে। বাঙালী বাবুর পরিবারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরা একটা ঠিকানা দিয়েছে, সেখানে চীনেদের কাছে নাকি আছে সেই বাঙালী বাবুর পরিবার। বাচ্চার ছেলে কুলদীপ চলে গেছে সেখানে, ফৌজী লোক কিছু সঙ্গে গেছে। তাই যদি হয়, যদি পাওয়া যায় বাঙালী বাবুর পরিবারটিকে সেখানে, তা'হলে প্রমাণ হবে যে এরা মিথ্যে কথা বলছে না।"

"কিন্তু কেন বাচ্চাকে খুন করা হোল ? সে তো কখনও কারও সঙ্গে দুশমনি করেনি।"

"বাচ্চা সিং প্রাণপণে বাধা দিয়েছিল। বাচ্চা সিং একটি আওরতের ধর্ম বাঁচাতে গিয়েছিল।"

নিস্তব্ধ হোয়ে গেলেন বৃদ্ধ গুরু। আর কয়েকবার পাক খেলেন আস্তে আস্তে। তারপর স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন—"চীনেদের হাতে সেই আওরতটি গেল কেমন করে ?"

অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন চেলা—"এরা চীনেদের নোকর। এরা দেশের সঙ্গে বেইমানি করছে। চীনেদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে এরা নিজেদের মা বোনকে পর্যন্ত বলি দিতে পারে।"

সেই অবস্থায় ওপর দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে অন্তরীক্ষে অদৃশ্য লেখা পড়ে গেলেন বৃদ্ধ—"এরা জাহান্নামে যাক। দেশের সঙ্গে যারা বেইমানি করে তাদের দয়া করা পাপ। সেই আওরতকে

বাঁচাবার চেষ্টা করা উচিত। ফৌজী লোক যারা গেছে কুলদীপের সঙ্গে, আশা করি তারা চীনেদের সঙ্গে মোকাবিলা করে তাকে উদ্ধার করে আনবে। সেই মেয়েকে আমার কাছে দিয়ে যেও।"

বেইমানদের ভাগ্য নির্ধারিত হোয়ে গেল।

ভাগ্য ভবিতব্য ভূত ভবিষ্যৎ ভগবান বিলকুল পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে বেঁচেছে তার কাছ থেকে। তবু সে বেঁচে আছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা পাঁশুটেরঙের প্রকাণ্ড একটা বালিশের খোল জাতীয় বস্তু দিয়ে ঢাকা এক ভয়ংকরী মূর্তি, এক হাত লম্বা আধ হাত চওড়া ছোট্ট একটি ফোকরে মুখ রেখে তাকিয়ে আছে দূর আকাশের পানে। আকাশের সঙ্গে বরফঢাকা পাহাড় মিশে গেছে যেখানে সেখানে তার নজর। কি দেখছে সে! এমন কি আছে ওখানে যা দিনের পর দিন একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখা যায়!

কিছু নেই। রিক্ততার অতি বাস্তব ছবি। বরফ আকাশ আকাশ বরফ, কখনো ঢেকে যাচ্ছে মেঘে, কখনও রোদে ঝলসে উঠছে। রঙ পালটাচ্ছে না, রূপ বদলাচ্ছে না, হাসছে না, কাঁদছে না। শাশ্বত সত্যের মত স্থির অচঞ্চল। ঐ আকাশ ঐ পাহাড় ঐ বরফ কোনও কালে পরাজয় স্বীকার করবে না কারও কাছে, কিছুতেই ওর পরিবর্তন নেই।

তাই সে তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ দিনের আলো থাকে, ততক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে। নড়ে না ফোকরের পাশ থেকে। নড়ে যাবে কোথায়! খাঁচায় পোরা জীব, খাঁচা থেকে মুক্তি পাবে না। শুধু শুধু ছটফট করে লাভ কি!

পাহাড়ী শহর। শহরের জলুস যেখানে সেটা ওপর তলা। সেখানে বড় বড় হোটেল, সাহেব লোকদের বাড়ি, দোকান বাজার

সিনেমা। থরে থরে পাহাড়ের গায়ে বসানো হোয়েছে শহরটিকে। ওপর তলা থেকে নামতে নামতে একদম নীচের তলায় এলে দেখা যাবে চীনেদের বস্তি। দাঁত উপড়াবার ডাক্তার আছে, জুতো সেলাইয়ের কারখানা আছে, ছোট ছোট হোটেলও আছে কয়েকটি। কি ওদের পেশা, কি করে ওরা ওদের খাওয়া পরা চালায়, সেটাই আশ্চর্য। তবু ওরা আছে, দিব্যি ঘরসংসার পেতে বাস করছে। হরদম মনিঅর্ডার আসছে ওদের কাছে। চা বাগান থেকে আসছে, সেখানে ওদের আপনজনেরা ছুতোরের কাজ করে। কলকাতা থেকে আসছে, সেখানে ওদের জুতোর কারবার আছে। আসমুদ্র হিমাচল সর্বত্র আছে ওদের স্বজাতি, সবাই টাকা পাঠাচ্ছে। ওদের অভাব নেই।

চীনে বস্তির দাঁত উপড়াবার ডাক্তারের বাড়ি। সামনে ডাক্তারখানা, যথাবিহিত দাঁতের যন্ত্রপাতি সাজানো রয়েছে সেখানে। সেখানেই ডাক্তার সপরিবারে বাস করেন। পাহাড়ে যেমন নিয়ম, রাস্তার ধারে খাদের ভেতর খোঁটা পুঁতে বাড়ি বানানো হয়েছে। বাড়ির সামনেটা সবাই দেখতে পায়, পেছনে কি আছে দেখা যায় না। ডাক্তার তাঁর বাসগৃহের পেছনে কায়দা করে একটি কাঠের খাঁচা বানিয়েছেন। সেটার অস্তিত্ব সহজে কেউ টের পায় না। সেই খাঁচায় বন্ধ আছে একটি জীব। তার ভূত নেই ভবিষ্যৎ নেই বর্তমান নেই। ছোট্ট একটি ফোকরের ভেতর দিয়ে ঠায় তাকিয়ে থাকে সে দূর পাহাড়ের চূড়োয়। বরফে ঢেকে আছে সেই চূড়ো, আকাশ মিশে আছে সেই বরফের সঙ্গে। কখনও মেঘে ঢেকে যায়, কখনও রোদে চকচক করে। শাশ্বত সত্য, মৃত্যুর মত স্থির অচঞ্চল, মৃত্যুর মত হিমশীতল।

খাঁচার ভেতরটাও মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা। আলো নেই, আগুন নেই, দু'হাতে স্পর্শ করা যায় এমন কিছুই নেই। ছেঁড়া কম্বল

আছে বটে কয়েকখানা, সেগুলোর গন্ধে প্রেতও পালিয়ে বাঁচে। দিনে একবার রাতে একবার ছু'বার ডাক্তার গৃহিণী ছু'বাটি ভাত আর খানিকটা অতি ছুর্গন্ধ মাংস নিয়ে সেই ঘরে প্রবেশ করেন। মাংসটা যে কোন্ জানোয়ারের তা বোঝা যায় না। স্পর্শও করে না সেই খাঁচায় বন্ধ জীবটি সেই অপূর্ব খাদ্যবস্তু। তবু সে বেঁচে আছে, কেন বেঁচে আছে, কি উদ্দেশ্যে বেঁচে আছে তা' সে নিজেই জানে না। ঐভাবে বেঁচে থাকার মিয়াদ যে কবে ফুরবে তাও বোধ হয় সে ভাবে না।

অবশেষে একদিন সেই মৃত্যুর মত স্থির অচঞ্চল খাঁচাটার গায়ে নাড়া লাগল। দিনের আলো তখন দেখা যাচ্ছিল ফোকরের ভেতর দিয়ে, সে দাঁড়িয়েছিল ফোকরের পাশে। হঠাৎ খাঁচাটা ভয়ানক ভাবে দুলে উঠল। দরজা খুলে অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে ঢুকে পড়ল সেই খাঁচার মধ্যে, ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে বিচিত্র সুরে বিচিত্র ভাষায় তারা কিচিরমিচির করতে লাগল। পরামর্শ করে যা ঠিক করলে তারা, তা' কাজে পরিণত করতে লেগে গেল তৎক্ষণাৎ। ছুজন মেয়েমানুষ এগিয়ে এসে তার হাত ছুখানা বেঁধে ফেললে। তারপর তাকে সেই ছুর্গন্ধ কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে ফেললে। একখানা বস্তার মধ্যে পুরলে সেই কম্বল জড়ানো দেহটা, কয়েক টুকরো ভারী পাথর ঢুকিয়ে দিলে সেই বস্তায়। তারপর খাঁচার মেঝের তক্তা তুলে বস্তাটাকে সেই ফাঁক দিয়ে ছেড়ে দিলে।

ঠিক তলাতেই দাঁড়িয়েছিল ছুটি ফৌজী জোয়ান। বস্তাটিকে সন্তর্পণে ধরে নামিয়ে নিলে তারা, কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই বস্তা দড়ি কম্বল কেটে সংজ্ঞাহীন দেহটাকে বার করে ফেললে। তারপর তারা সেই দেহ বয়ে নিয়ে খাদের মধ্যে নেমে গেল।

অনেক রাতে পাহাড়ী শহরের নীচের তলায় চীনে বস্তিতে আগুন লাগল। তুমদাম শব্দে বোমা ফাটল কয়েকটা। ওপর তলার মানুষেরা মোটেই ব্যস্ত হলেন না। চীনেরা আতশবাজি বানায়, সব কর্মই ওদের বেআইনী। সেই আতশবাজিতেই আগুন লাগল বোধ হয়। আগেও কয়েকবার চীনে বস্তিতে আতশবাজির দরুন আগুন লেগেছে।

যথাসময়ে ওপরের মানুষেরা জানতে পারলেন যে চীনে বস্তিটাই নেই। যতগুলো ঘরবাড়ি ছিল সব পুড়ে ভস্মীভূত হোয়েছে, কিছুই রক্ষা পায়নি।

আর একটি কথাও ক্রমে ছড়িয়ে পড়ল। চীনে বস্তির মানুষ-গুলোও নাকি সব মারা গেছে, মেয়ে পুরুষ আণ্ডাবাচ্চা এক প্রাণী বেঁচে নেই। তার মানে, প্রচুর পরিমাণে সহজ-দাহ্য-পদার্থ জমা করেছিল ওরা, বেআইনী ব্যবসা চালাতে ওদের চেয়ে ওস্তাদ আর কে আছে। ভাগ্যে ওরা শহরের মাঝখানে ঐ কাণ্ড করেনি। শহরের মাঝখানে চীনে বস্তি থাকলে কি আর রক্ষে ছিল, কোন দিন গোটা শহরটাই ওরা পুড়িয়ে ছারখার করে ছাড়ত।

পাহাড়ী শহরের শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হোলেন।

প্রকৃত ব্যাপারটা যাঁরা জানবার তাঁরা জানলেন। তাঁদের চর অনুচররা পরীক্ষা করার সুযোগে পেলেন আধপোড়া ঝলসানো দেহগুলো, প্রতিটি শরীরে স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। কুপিয়ে কাটা হোয়েছে, বুলেটের ছেঁদা রয়েছে অনেকগুলো শরীরে। ম্যাস্ ম্যাস্যাকার, কারা করলে এ কাজ!

সুদূর শহর কলকাতায় যখন ঐ সংবাদ পৌছল, তখন তিন মিনিট বিলম্ব হোল না সংকল্প ঠিক করতে। অত্যাচারিত উৎপীড়িত শোষিত জনগণের আদি এবং অকৃত্রিম বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন—পালটা আঘাত হানতে হবে। চা বাগানওয়ালা দস্তিদার

বড় বাড় বেড়েছে। আর ওকে বাড়তে দেওয়া যায় না। এমন আঘাত হানতে হবে যে কখনও কোনও ক্যাপিটালিস্ট সর্বহারাদের পেছনে লাগবার সাহস করবে না।

ঢং ঢং ঢং ঢং।

মহাকালের কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বারো ঘা পড়ল। নদীর ধারে পাতালগর্ভে সেই অন্ধকার ঘর, একদা যেখানে বম্বেটেরা মানুষ মেয়েমানুষ লুটে এনে জমা করত। কয়েকটি লোক বসে আছে সেই ঘরে, অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। মুখ দেখার নিয়ম নেই, কেউ কাউকে চিনতে পারবে না তাই ঐ ব্যবস্থা। কারণ বম্বেটেরা ওদের লুটে আনেনি, ওরা স্বেচ্ছায় এসেছে। এসেছে সবাই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানা যাবে, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে কি না।

খুব সামান্য একটু আওয়াজ হোল। আওয়াজটুকু সবাই চিনতে পারলে। ও আওয়াজ চেনা যায়, যাদের ঘরে মা বোন আছে তারা ঐ জাতের আওয়াজ অহরহ শোনে। সোনার গয়নার সার্থকতা তার দামে নয়, তার চোখধাঁধানো জেল্লায় নয়, সার্থকতা ঐ শব্দটুকুতে। চুড়ি বালা কঙ্কণরা হয়তো একদিন থাকবে না, তাতে দেশের কতখানি উন্নতি হবে, সে হিসেব নিয়ে পরিকল্পনা-ওয়ালারা মাথা ঘামাকগে। কিন্তু প্রতি সংসার থেকে ঐ রহস্যময় মিষ্টি আওয়াজটুকু যে উঠে যাবে! একশ' মেগাটনের পরমাণু বোমার আওয়াজ দিয়ে কি ঐ কল্যাণময়ী শব্দটুকুর ক্ষতিপূরণ করা যাবে!

সবাই কান পাতল। যাঁর হাতের চুড়ি বালারা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করল, এবার তিনি স্বয়ং কথা বললেন।

"বন্ধুগণ, আমাদের সভার কার্য শুরু হচ্ছে। প্রথমে আমাদের সভাপতি এখনকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কিছু বলছেন। তাঁর বক্তব্য শুনে আমরা আমাদের কর্তব্য স্থির করব। ইতিমধ্যে এমন অনেক ব্যাপার ঘটেছে যা আমরা জানি না। অপর পক্ষ ঘুমিয়ে নেই, তারা তাদের কাজ সুশৃঙ্খলে সম্পাদন করে চলেছে। বাইরের শত্রু যত এগিয়ে আসছে, ততই ঘরের শত্রুরা সক্রিয় হোয়ে উঠছে। সুতরাং এখন সময় হোয়েছে আমাদের সক্রিয় হবার। শুনুন এখন আমাদের সভাপতি কি বলেন, তারপর আমাদের যা বলার আছে বলব।"

মিনিটখানেক চুপচাপ কাটল। তারপর সভাপতি শুরু করলেন। তাঁর স্বর উঠল না নামল না, আগাগোড়া এক ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য বলে গেলেন। যেন একটা কল, কলটার হৃদয় বলে কোনও কিছুর বালাই নেই, তাই সেটা কিছুতেই একটু উত্তপ্ত হয় না উত্তেজিত হয় না। ওজন করা একমাপের কথাগুলো কল থেকে পর পর বেরিয়ে আসতে লাগল।

"বন্ধুগণ

আপনারা জানেন, আমি আমাদের সীমান্তের শহরগুলো ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেই সব শহরে এখন বড় বড় সভা হচ্ছে। দেশের নেতারা হরদম যাচ্ছেন ওধারে, বক্তৃতা দিচ্ছেন লোকের মনোবল অক্ষুন্ন রাখার জন্যে এবং প্রতিরক্ষা তহবিলে চাঁদা তোলবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছেন। কয়েক দিন আগে সেই রকম এক সভায় হঠাৎ চড়াও হন আমাদের কমরেডী দল। যথাবিহিত সোডার বোতল এবং ইট পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটল। একদল শিখ আগে থাকতে তৈরী হোয়ে ছিল। অতর্কিতে তারা কৃপাণ চালিয়ে কয়েকটি কমরেডকে সেখানেই খতম করে দেয়। কয়েক জনকে পাকড়াও করে নিয়ে

যায়। কমরেডদের মুখ শক্ত নয়, অত্যাচারিত উৎপীড়িত শোষিত জনগণের সামনে অবিরাম বকতে বকতে ওঁদের মুখের খিল খসে গেছে। তাঁরা একটি আড্ডার কথা বললেন। আড্ডাটি এক পাহাড়ী শহরের পদতলে। শিখেরা আড্ডাটি চড়াও করে। শিখের স্বজাতি শিখ, বিস্তর শিখ আমাদের জোয়ানদের মধ্যে রয়েছে, অস্ত্রশস্ত্রের অভাব হয়নি। কিছু ফৌজী লোকও বোধ হয় ছিল। অতি চমৎকার কাজ করে এসেছে তারা, আড্ডাটিকে পুড়িয়ে ছাই করেছে, সেখানে যারা বাস করত তাদেরও শেষ করে ফেলেছে, একটি প্রাণী রেহাই পায়নি। অমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজ একমাত্র শিখেরাই করতে পারে। কিন্তু মুশকিল হোয়েছে এই যে—"

সভাপতি একটু থামলেন, সম্ভবতঃ মুশকিলটা ঠিক ভাবে বোঝাবার জন্যে তাঁর বক্তব্যটুকু গুছিয়ে নিতে গেলেন তিনি। সেই ফাঁকে একজন প্রশ্ন করল—"শিখেরা হঠাৎ খেপে উঠল কেন? বিনা কারণে তো ওরা কখনও কারও বিরুদ্ধে লাগে না।"

"কারণ ছিল"—সভাপতি মশাই কারণটি তখন ব্যক্ত করলেন। "কলকাতা থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক এবং তাঁর স্ত্রী গিয়েছিলেন পাহাড়ে বেড়াতে। সেখানে তাঁরা সস্তায় এক গাড়ি কিনে ফেললেন। সেই গাড়ি চেপে তাঁরা ফিরছিলেন কলকাতায়, সঙ্গে নিয়েছিলেন ওখানকারই এক শিখ ড্রাইভার। মালদার এধারে সবহারাদের পাল্লায় পড়ে গেলেন তাঁরা। শিখ ড্রাইভার তার ছোট্ট কৃপাণখানি হাতে নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে প্রাণ দিল। সেই দেহটা পড়ে রইল পথে, কিছুক্ষণ পরে এক লরি যাচ্ছিল সেই পথে। তারা সেই দেহটা তুলে নিয়ে গেল। শিখ কখনও প্রতিহিংসা নিতে ভোলে না। ড্রাইভারের ছেলে ধরে ফেলল সেই গাড়ি যেখানি নিয়ে তার বাবা কলকাতায় আসছিল। তারপর

ওরা জানতে পারল কারা কাজের কাজী। কাজের কাজীদের পাকড়াও করার জন্যে সেই সভায় উপস্থিত হোল। কিন্তু মুশকিল হোয়েছে এই যে—"

আবার বাধা পড়ল। আবার কে জিজ্ঞাসা করলেন—"কলকাতার সেই ভদ্রলোক আর তাঁর স্ত্রীর কি হোল?"

এবার একটু বেশী সময় লাগল, মিনিট দুয়েক নিস্তব্ধ হোয়ে রইল সেই পাতালপুরী। তারপর শোনা গেল সভাপতির সেই স্বর। বললেন—"ভদ্রলোকটিকে খুন করা হোয়েছে। তাঁর লাশ পুলিসের হেপাজতে আছে। তাঁর স্ত্রীকে আটকে রাখা হোয়েছিল পাহাড়ী শহরের আড্ডায়। শিখেরা তাঁকে উদ্ধার করে এনেছে। কিন্তু কোনও লাভ নেই সেই হতভাগীকে বাঁচিয়ে রেখে, তাকে বিষ দিয়ে কিংবা অন্য কোনও উপায়ে মারতে হবে।"

"কেন? কেন?" একসঙ্গে বহু জন ঐ প্রশ্নটি করে ফেললে।

একেবারে খাদে নেমে গেল সভাপতির কণ্ঠ। এতক্ষণ পরে বোঝা গেল মানুষেই কথা বলছে, কল থেকে কথাগুলো বার হচ্ছে না। অসীম লজ্জা নিদারুণ ক্ষোভ দুর্নিবার জ্বালা ধরা পড়ল সেই স্বরে। বললেন সভাপতি—"তার কারণ সেই হতভাগীকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন এঁরা এঁদের প্রভুদের পায়ে। তারা সবাই মিলে বাঙালী মেয়ের সেই দেহটা নিয়ে—"

বাকীটুকু আর বলা হোল না। অন্ধকার ঘরখানায় শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ার শব্দটুকুও আর শোনা গেল না।

অতঃপর সভাপতি বুঝিয়ে বললেন, মুশকিলটা কোনখানে বেধেছে। ভারতবর্ষের হিতকামীরা, যাঁরা মুক্তিফৌজকে আহ্বান করে এনেছেন, তাঁদের ধারণা হোয়েছে যে পাহাড়ী শহরের সেই

আড্ডাটি পুড়িয়ে শেষ করেছে ক্যাপিট্যালিস্ট গুষ্টির লোক। সেই জন্যে ওঁরা মরিয়া হোয়ে উঠেছেন। খুব শিগ্‌গির ও'রা পালটা আঘাত হানবেন, সে জন্যে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তার আগে একটি কাজ করেছেন ওঁরা, সরকারের পুলিসকে লেলিয়ে দিয়েছেন চা বাগানওয়ালা দস্তিদারের পেছনে। দস্তিদার লোকটাই নাকি যত নষ্টের মূল। তাকে ধরবার জন্যে পুলিস উঠে পড়ে লেগেছে।

"মিস্টার দস্তিদার এখন আছেন কোথায়?" একজন প্রশ্ন করলেন।

সভাপতি বললেন—"তা' একমাত্র সেই দস্তিদারই জানে। সে বেচারা কিন্তু কোনও দোষে দোষী নয়। মারপিট করল শিখেরা, দস্তিদার বেচারা তার জন্য দায়ী হোয়ে পড়ল। সে যাক, দস্তিদার লোকটা যদি ধরা পড়ে, তখন সরকার না হয় তার মাথাটা কেটে নেবেন। আমরা ভাবছি দস্তিদারের মেয়েটার কথা। আপনারা জানেন বোধ হয়, দস্তিদারের একমাত্র একটি কন্যা আছে। কন্যাটিকে দস্তিদার সাধ্যমত লেখাপড়া নাচগান শিখিয়েছে। মেয়েটির নাচগানে একটু নামও হোয়েছে—"

একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন—"যশোদা, যশোদা, যশোদা দস্তিদারকে কে না চেনে!"

"হাঁ, সেই যশোদা।" সভাপতি বক্তৃতা শুরু করলেন—"সেই যশোদাকে নিয়েই বেধেছে গোলমাল, তাকে—"

প্রায় চিৎকার করে উঠলেন একজন—"তাকে ওরা হাতে পেয়েছে নাকি!"

সভাপতি বললেন—"এখনও বোধ হয় পায়নি, তবে শিগ্‌গির পাবে। সেই মেয়েটা কলকাতায় এসেছে। বেপরোয়া ভাবে চলাফেরা করছে, তাকে সামলাবারও কেউ নেই। এই সুযোগে যদি—"

নারীকণ্ঠে চরম একটি কথা বলা হোল—"তা'হলে আমরা চরম প্রতিশোধ নোব।"

একসঙ্গে অনেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হোল—"ঠিক তাই।"

ঢং ঢং।

দুটি ঘা পড়ল মহাকালের কপালে। সভার কাজ শেষ হোল। যশোদা দস্তিদার কোথায় আছে তা' জানতে পারলেন সকলে। ঠিক হোল, যশোদাকে পাহারা দেওয়া হবে। এমন ভাবে পাহারা দেওয়া হবে যে যশোদা টের পাবে না। তার মর্জি মাফিক চলাফেরা করবে সে, যেমন করছে। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। কোনও দিক থেকে যদি কেউ যশোদার ধারেকাছে ঘেঁসবার চেষ্টা করে তা'হলে তার রক্ষে নেই। দস্তিদার কন্যা যশোদার জন্যে খুন করতে এবং খুন হোতে সকলেই প্রস্তুত।

শেষ কথাটি উচ্চারণ করলেন সভাপতি—"টোপ, মেয়েটাই হোল উৎকৃষ্ট টোপ। ওর জন্যে অগাধ জলের তলা থেকে রাঘববোয়ালেরা উঠে আসবে, কোনও সন্দেহ নেই।"

উৎকৃষ্ট টোপ যশোদা দস্তিদার তার পিসীর ফ্লাটে জাঁকিয়ে বসেছে। আরও কয়েকবার সে পিসীর কাছে থেকে গেছে, স্থানটি তার অচেনা নয়। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাবে থাকত কৃষ্ণা, নিজেই রান্নাবান্না করে খেত। একখানি গাড়ি ছিল, ড্রাইভার রেখেছিল, ঐটুকু ছিল তার বড়মানুষী চাল। একান্ত প্রয়োজন না পড়লে পথে বেরত না, তাই তাকে গাড়ি চড়ে বেড়াতে দেখত না কেউ।

ড্রাইভারের কাজ ছিল দোকান বাজার করে দেওয়া। ঐ করেই সে মাইনে পেত মোটা রকম। আর একটি লোক রেখেছিল মাজা ধোওয়া কাজগুলোর জন্যে, মাসে দশ দিন সে কামাই করত। কারণ কাজ বলতে কিছুই ছিল না, তাই কামাই করলেও তার চাকরি যেত না, মনিব ঠাকরুন নিজেই সব কাজ সমাপ্ত করে ফেলতেন।

ভাইঝিটি এসে সম্পূর্ণ বিপরীত চালে চলতে শুরু করলেন। ফ্লাটটার ভোল ফিরে গেল। জানলায় দরজায় দামী পর্দা ঝোলানো হোল, আলোগুলো বদলে হালফ্যাসানের করা হোল, বারান্দায় ঝুলতে লাগল বাহারী লতাপাতার টব। নেপালী চাকর বেয়ারা দরোয়ান সঙ্গে নিয়ে এলেন ভাইঝি। দামী উর্দি চড়িয়ে তারা হুকুম তামিল করার জন্যে খাড়া রইল হামেহাল। আর হুকুম! হুকুমের যেন শেষ নেই। কৃষ্ণার ড্রাইভারটি সদাসর্বক্ষণ ঘুরতে লাগল গাড়ি নিয়ে, হয় কোনও বন্ধুকে আনতে চলেছে, নয় কাউকে কোথাও পৌঁছে দিচ্ছে। অগুনতি বন্ধু বান্ধবী, শহরটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সর্বত্র দস্তিদার কন্যার পরিচিত মানুষরা বিরাজ করছেন। বিরাট ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। সে তল্লাটে যাঁরা বাস করেন, দু'দিনের মধ্যে তাঁরা জানতে পারলেন কে এসেছে কৃষ্ণা দস্তিদারের ফ্লাটে বাস করতে। যশোদা নামটা মুখে মুখে ফিরতে লাগল। গণ্ডাকতক চা বাগানের মালিক যশোদা দস্তিদার। মালিক অবশ্য বাপ গোপিকারমণ দস্তিদার, বাপ মলেই ঐ মেয়ে মালিক হবে। মেয়ের মত মেয়ে, দেশ সরগরম করে বাস করা কাকে বলে তা' মেয়েটি জানে।

মেয়েটি আরও অনেক কিছুই জানে, যোগজীবন দেখছিল

আর ভাবছিল। ভাবছিল এই মানুষকেই সে পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে আর এক রকম দেখেছে। সেখানকার চোখজুড়ানো সবুজের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলে সবুজ হোয়ে বেঁচে ছিল এই মেয়ে। তখন তাকে চেনা যেত, তার কাছে পৌছনো যেত। সেই যশোদাকে দেখেছে সে আদিবাসী নাচের অদ্ভুত সাজে সেজে থাকতে, সেই যশোদার সঙ্গে চা বাগানের শ্রমিক সেজে গিয়েছিল সে শ্রমিকদের মিটিঙে। পুলিস সাহেবের গাড়ীতে যখন উঠেছিল যশোদা তখন তার আর এক রূপ। বহু বিচিত্র সাজে সজ্জিতা এক যশোদাকে সে চিনত জানত, তার কাছ থেকে রাইফেল পিস্তল চালাতে শিখেছে। আরও অনেক কিছুই জেনেছিল শিখেছিল, কারণ সেই যশোদাকে সে ভয় করত না। এই যশোদাকে কিন্তু সে চেনে না। একে দেখলে তার ভয় করে, এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নিজেকে কেমন যেন অসহায় বলে মনে হয়। জ্বলছে যেন মেয়ে, সদাসর্বক্ষণ একটা উত্তাপ ঘিরে রয়েছে যেন ওর আপাদমস্তক। একটা অজানা আতঙ্কে যোগজীবনের বুক কাঁপে।

বরাত ভাল যে যশোদার সঙ্গে যোগজীবনকে বাস করতে হোচ্ছে না। দস্তিদার চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে, যোগজীবন সেখানেই উঠেছে। তাঁরা বাঙালী নন, রাজস্থান থেকে এসে কলকাতায় কারবার করছেন। একটিও আজেবাজে প্রশ্ন করলেন না তাঁরা, যোগজীবনকে তার ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে যখন খুসি সে বাইরে যেতে পারে, যখন মর্জি হয় ফিরে ঘর খুলে শুয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারে, বাড়ীর লোকরা জানতেও পারবে না। যা দরকার ঠিক তাই পেয়েছিল যোগজীবন, কোনও অশান্তি ছিল না। অশান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে যশোদার সঙ্গে দেখা করা, যশোদার কাছে গেলেই তাঁর বুক কাঁপে। যেতেও হয়, না গিয়ে উপায় নেই। দামী

সাজপোশাক পরে বড়লোকের ছেলে সেজে যেতে হয়। দস্তিদার বলে দিয়েছিলেন যশোদার সঙ্গে সপ্তাহে দু'এক দিন দেখা করতে, যশোদাই বলে দেবে কখন কোথায় দেখা করতে হবে।

যশোদা তা' বলছিল। এমন দিনে এমন সময় যেতে বলছিল তার ফ্লাটে যখন কেউ সেখানে থাকে না। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচ্ছিল, কোথায় কোথায় গেল যোগজীবন, কি দেখল কি শুনল। তখন দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করছিল ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। কাজ অনেক, চারিদিকে নজর রাখতে হবে। যে সব জায়গায় নজর রাখতে হচ্ছে যোগজীবনকে সে জায়গাগুলোর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। সেই জুতোর দোকানগুলো, যেখান থেকে বহুবার সে তার মনিবের জন্যে জুতো নিয়ে গেছে। সেই পোশাক ধোয়াবার দোকানগুলো যেখানে যেখানে সে মনিবের পোশাক ধোয়াত। অনেকগুলো দোকান বন্ধ হোয়ে আছে, কয়েকটায় অন্য লোক অন্য কারবার খুলে বসেছে। তা' খুলুক, তবু তাকে রোজ একবার সবকটা দোকানের সামনে এক পাক দিয়ে আসতে হয়। নতুন কিছু দেখলে যশোদাকে জানাতে হয়।

কোনই নতুনত্ব নেই। রোজ একঘেয়ে কাজ, একই জায়গায় রোজ ঘোরাফেরা করা, বিরক্ত হোয়ে উঠছিল যোগজীবন। হঠাৎ হাওয়া পালটাল। যশোদা বললে—"কাল আসবেন বেলা তিনটের সময়, দূর থেকে নজর রাখবেন এই বাড়ির দরজায়। চারটের মধ্যে একজন ভদ্রলোক এখানে আসবে। ট্যাক্সিতেই আসবে বোধ হয়, হেঁটেও আসতে পারে। লোকটিকে নিয়ে আমি অন্ততঃ একবার ব্যালকনিতে যাব। সেই ফাঁকে আপনি তাকে দেখে নেবেন বেশ করে। যখন সে বেরিয়ে যাবে এই বাড়ী থেকে তখন তার পিছু নেবেন। যদি সম্ভব না হয়, সে যদি

কোনও গাড়িতে উঠে চলে যায়, তা'হলে নজর রাখবেন আপনার সেই জুতোর দোকানগুলোয়। ঐ লোকটিকে কোথাও দেখতে পান কি না আমি জানতে চাই।"

সেই পুরনো কাজ, যা সে তার পুরনো মনিবের কাছে করত। ঠিক আছে, যা হোক তবু একটা কাজ পাওয়া গেল। যোগজীবন চাঙ্গা হোয়ে উঠল।

পরদিন ঠিক সময় গিয়ে ভদ্রলোকটিকে সে দেখে এল। ট্যাক্সি চেপে এলেন তিনি। মোটা মানুষ, ছোট ট্যাক্সি থেকে বেরতে বেশ কষ্ট হোল। ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে ভাড়া দিলেন। একটু সময় লাগল চেঞ্জটা ফেরত পেতে, সেই ফাঁকে যোগজীবন তাঁর মুখটা ভাল করে দেখে নিল। কালো মোটা ফ্রেমের চশমা পরে আছেন, মাথার সামনেটা চকচক করছে, থুতনিতে অল্প একটু দাড়ি। পরে আছেন খদ্দরের পাজামা। সব ঠিক আছে, বগলের ব্যাগটি পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে উনি একটি দালাল। কিসের দালালি করেন উনি।

উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে যোগজীবন তাকিয়ে রইল সামনের ব্যালকনির দিকে। একটু পরে যশোদা সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। একটা বাহারী টবের বাহারী লতা দেখিয়ে কি যেন তাঁকে বোঝাতে লাগল। যোগজীবন আর দাঁড়াল না, যা দেখার তা দেখে নিয়েছে। কিন্তু থুতনির ঐ দাড়িটুকু! ঐটুকু কামিয়ে ফেলেন যদি উনি, তা'হলে হঠাৎ ওঁকে চিনে বার করা যে মুশকিল হবে।

পর পর কয়েক দিন যোগজীবন তার চেনা জুতোর দোকানগুলোর সামনে সকাল দুপুর সন্ধ্যে টহল দিতে লাগল।

মোটা মানুষ, থুতনিতে দাড়ি আছে কিংবা নেই, চোখে চশমা থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, এমন কেউ যদি আসে, তার পিছু নিতে হবে। সেদিন ঐ কাজটি করা হয়নি। যোগজীবন বুঝতে পেরেছিল ট্যাক্সিতে যখন এসেছেন তখন ট্যাক্সিতেই যাবেন। মোটা মানুষ, ট্যাক্সিতে না চাপলে বাসে ট্রামে উঠবেন কেমন করে। জুতোর দোকানে যদি আসেন ট্যাক্সি চেপেই আসবেন। ট্যাক্সি কিংবা কোনও প্রাইভেট কার। গাড়ি চেপে কোনও খদ্দেরই আসে না জুতোর দোকানগুলোয়। পায়ে হেঁটে যারা আসে তারা কেউ মোটা নয়। তা'হলে! আর দু'একটা দিন দেখে ক্ষান্ত দেবে ঠিক করল যোগজীবন, অনবরত এক জায়গায় ঘোরাঘুরি করলে লোকে সন্দেহ করতে পারে। সেদিনই লোকটার পিছু নেওয়া উচিত ছিল। আর একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে যদি—।

বড়লোকদের পাড়ায় ছাই ট্যাক্সিও মেলে না। কখন তিনি বেরিয়েছিলেন যশোদার ফ্লাট থেকে তাই বা কে জানে। তারপর আর দেখা করা হয়নি যশোদার সঙ্গে। এবার একদিন দেখা করে বলে আসবে যে লোকটির টিকিও দেখা গেল না।

টিকি নয় টাক। হঠাৎ যোগজীবন সেই টাকটিকে দেখতে পেলে। বসে আছেন একখানা গাড়ির মধ্যে, পাশে একটি মহিলাও রয়েছেন। গাড়িখানি দাঁড়িয়েছে এক জুতোর দোকানের সামনে, দোকানটি থেকে যোগজীবন বহুবার তার মনিবের জুতো নিয়েছে। গাড়ীর পাশ দিয়ে যোগজীবন বারদুয়েক যাওয়া আসা করল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হোয়েছে, থুতনির দাড়িটুকু কামিয়ে ফেলেছেন। এমনও হোতে পারে, সেদিন ঐ দাড়িটুকু

লাগিয়ে নিয়ে উপস্থিত হোয়েছিলেন যশোদার কাছে! জুতো কেনা রোগে যখন ধরেছে তখন কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

খানিক পরে যোগজীবন দেখল, দোকান থেকে একজন লোক বেরিয়ে এল কয়েকটা জুতোর বাক্স নিয়ে। বাক্সগুলো সে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেল। যোগজীবন গাড়ীর নম্বরটা মনে মনে আওড়াতে লাগল। সেদিনও পিছু নেওয়া হোল না।

পরদিনও ঠিক সেই সময় ঠিক সেই গাড়ীখানিকে দেখা গেল সেই জুতোর দোকানটির সামনে। যোগজীবন তৈরী হোয়ে গিয়েছিল। যে বাড়ীতে সে থাকত, সেখানকার এক ছোকরাকে বলে একখানি প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভার বাঙালী, তৈরী ছেলে। যোগজীবন তাকে বলে রেখেছিল একখানি গাড়ির পিছু নিতে হবে। রহস্যের গন্ধ পেয়ে ছোকরা খুশিয়ে উঠেছিল। দূরে গাড়ি রেখে যোগজীবন হাঁটাহাঁটি করছিল দোকানের সামনে। দেখল, আবার কয়েক জোড়া জুতো উঠল টাকওয়ালা ভদ্রলোকটির গাড়িতে। সেদিন আর তাঁর পাশে কোনও মহিলাকে দেখা গেল না।

তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠল যোগজীবন। টাকওয়ালার গাড়ি ছাড়ল, যোগজীবন তার ড্রাইভারকে দেখিয়ে দিলে। আধ ঘণ্টার মধ্যে এক ভদ্র গৃহস্থ পাড়ায় ঢুকল দুই গাড়ি। একটু পরে ড্রাইভার বললে—"ওখানা থেমেছে স্যার, আমরাও থামব?"

যোগজীবন বললে—"আস্তে আস্তে চলে যাও ওই গাড়ীর পাশ দিয়ে, আমি ঐ বাড়ির নম্বরটা শুধু দেখে নোব।"

তাই হোল। যোগজীবনের গাড়ি আর একটা রাস্তায় এসে উঠল। একটা সিনেমার সামনে নেমে গাড়ী ছেড়ে দিলে যোগজীবন, ভাড়া বাদে পাঁচ টাকা বকশিস দিলে। খুশী

হোয়ে ছোকরা বললে—"দরকার পড়লে আবার খবর দেবেন স্যার।"

হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেল যোগজীবন সেই পাড়ায়। টাকওয়ালাটি যে বাড়িতে ঢুকেছিল সেই বাড়ির প্রায় সামনে এক চায়ের দোকান। পাড়ার দোকান যেমন হয়, কয়েক জন খদ্দের লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে বসে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে তর্কাতর্কি করছেন। দোকানে ঢুকে এক কোণে বসে পড়ল যোগজীবন। হাফ প্যাণ্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা দশ বার বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। যোগজীবন বলল এক কাপ চা দিতে। ছেলেটি প্রায় ভিক্ষা করার মত করে বললে—"একটা ডবল মামলেট্ দোব স্যার?"

"দাও" বলে যোগজীবন কান পাতলে। তর্ক হচ্ছে না ঠিক, কারণ খদ্দেররা সবাই এক মত। খুব বেঁটে ঘাড়ে গর্দ্দানে ঠাসা এক ভদ্রলোক মেয়েলী সুরে বলতে লাগলেন—"টু পাইস হবে যে অনেকের তাই যুদ্ধ যুদ্ধ করে চেল্লাচ্ছেন। ওরা তো ফিরে গেল ওদের সৈন্য সামন্ত নিয়ে, এখন আবার যুদ্ধ কোথায়? দেশের লোকগুলো গাড়ল, গাড়লদের যা বোঝাবে তাই বুঝবে। লক্ষ লক্ষ বেকার, চালের দাম হু হু করে বেড়ে চলেছে, ওধারে ওঁরা যুদ্ধের খরচা তুলছেন। যুদ্ধটা কোথায় হচ্ছে শুনি?"

একটি ছোকরা টেবিলের ওপর এক কিল মেরে লাফিয়ে উঠল। জ্বলন্ত তুবড়ির মত এক রাশ জ্বলন্ত কথা ছিটকে বেরতে লাগল তার মুখ থেকে। মনে হোল, হাতের কাছে পেলে সে দেশের যাবতীয় মিলওয়ালা আর মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের মুণ্ডগুলো কচাকচ কেটে নামাবে। বক্তৃতাটা হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলত, বাধা পড়ল। বয়েস

বাইশও হোতে পারে বেয়াল্লিশও হোতে পারে, কোমড়ে কাপড় জড়ানো সম্ভবতঃ যক্ষ্মাগ্রস্ত এক তরুণী ঢুকলেন দোকানে। তৎক্ষণাৎ যেন আগুনে জল পড়ল। তরুণী হুকুম করলেন—"এখনই আস্থন আপনারা, রঘুদা ডাকছেন।"

এক জন চিৎকার করে উঠল—"ফিরেছেন রঘুদা! কখন ফিরলেন?"

তরুণী বললেন—"একটু আগে, আপনারা আস্থন। যুব সম্মিলনের সব ঠিক ঠাক হোয়ে গেছে।"

নিমেষের মধ্যে দোকান খালি হোয়ে গেল। চা আর ডবল মামলেট নিয়ে যখন উপস্থিত হোল সেই ছেলেটি তখন যোগজীবন তার হাতে একটা টাকা গুজে দিয়ে পথে নেমে পড়ল। ছেলেটিই সেই ডবল মামলেট খাক।

"সেই জুতো কেনা রোগ" যশোদাকে বললে যোগজীবন। ভদ্রলোকের থুতনিটি একেবারে সাফ তাও জানাল। কোথায় কত নম্বর বাড়িতে থাকেন ভদ্রলোকটি তাও যোগজীবন দেখে শুনে এসেছে। যা শুনে এসেছে তাও বলল।

যশোদা বলল—"আমার কাছে বলেছেন মুরারি মুখার্জ্জি। আসল নাম বলেননি তা' আমি জানি। এইবার ওরা এক হাত খেল দেখাবে। পাখা গজিয়েছে কিনা, এইবার পুড়ে মরবে।"

যোগজীবন বললে—"আমরাও পুড়ে মরতে পারি।"

যশোদা বললে—"পারিই তো। আমার পিসী যে ভাবে মরেছে আমি কিন্তু সে ভাবে মরছি না। আমার গায়ে হাত দেবার আগে কয়েকজন খতম হবেই। তারপর আপনি আছেন।"

"আমি আছি!" যোগজীবন বোবা হোয়ে তাকিয়ে রইল

যশোদার মুখপানে কিছুক্ষণ। যখন কথা বলার সামর্থ ফিরে পেলে তখন বললে—"আমি তখন কোথায় থাকব, কি অবস্থায় থাকব, কে বলতে পারে!"

"আমার সঙ্গে থাকবেন"—সদাসপ্রতিভ যশোদা অসংকোচে জবাব দিল—"থাকবেন আমার সঙ্গেই। শেষ কাজটা আপনাকেই করতে হবে কিনা। সেই কাজটা করার জন্যেই বাবা আপনাকে সঙ্গে দিয়েছে।"

"কি কাজ সেটা? কই, আমাকে তো কিছু বলে দেননি।"

"সব কাজ কি সবাইকে বলে দিতে হয়! আপনি এমন মানুষ যে প্রয়োজন পড়লে বিনা দ্বিধায় আপনি আমার ওপরেও গুলি চালাতে পারেন।"

"কি বললেন!" যোগজীবন আঁতকে উঠল।

যশোদা নিঃশব্দে হাসতে লাগল দাঁত বার করে, জবাব দিলে না।

সন্ধ্যা হোয়ে এসেছে প্রায় তখন। যশোদাকে কোথায় বেরুতে হবে। যোগজীবন বিদায় নিলে। মনে মনে আওড়াতে লাগল—"তা' হবে না, কিছুতেই তা হবে না, কিছুতেই তা হবে না। সেই পাপটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে এইবার আমি ছুটি নোব।"

নিজের আস্তানায় ফিরে সুটকেশ খুলে কাপড়ের তলা থেকে রিভলভারটি বার করলে যোগজীবন। দস্তিদার ওটি তাকে উপহার দিয়েছেন। ছ'টি গুলি ভরা আছে, একটির পর একটি বেরবে! দস্তিদারের সামনে সে পরীক্ষা দিয়েছিল। তিন মিনিটের মধ্যে ছ'বার ফায়ার করে, একটা গাছের গায়ে ছোট্ট একটি কাঁসর টাঙানো ছিল, সেইটিই লক্ষ্য। ছ'বারের মধ্যে তিনবার কাঁসরের গায়ে গুলি লাগে। ভয়ানক খুশী হোয়ে পড়েছিলেন দস্তিদার,

সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ডজন গুলি আর রিভলভারটি তাকে উপহার দেন। দিয়ে বলেন—"জিনিসটি তোমায় দিলাম, হয়তো কোনও দিন কাজে লাগবে। দরকার না পড়লে ছুঁও না। ও জিনিস ছোঁয়া পাপ। আবার দরকারের সময় ব্যবহার না করাও পাপ। যাকগে, আমি জানি, তুমি ওর মর্যাদা রাখবে। ওর মত অত বড় বন্ধুও কেউ নেই, অত বড় শত্রুও কেউ নেই। যে কোনও সময় ও তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে। ওটি তোমার সঙ্গে আছে, জানতে যদি পারেন আমাদের সরকার বাহাদুর, তা'হলে অন্ততঃ দুটি বছর শ্রীঘর বাস। জানি, তোমায় সাবধান করতে হবে না। দশ পনরো দিনের মধ্যে যার হাতের টিপ ঠিক হয়, তাকে কোনও ব্যাপারের জন্যেই সাবধান করতে হয় না। সঙ্গে রাখ, তেমন অবস্থায় পড়লে দূর করে ফেলে দিও। ওর ওপর মায়া করতে নেই।"

মায়া!

রিভলভারটি হাতে নিয়ে উলটে পালটে দেখতে লাগল যোগজীবন, সত্যি চমৎকার জিনিস। চকচক করছে, ঠাণ্ডা, একটা বেশ মিষ্টি গন্ধও যেন বেরুচ্ছে। গন্ধটা কিসের!

মনে পড়ে গেল, এই গন্ধটা যশোদা ব্যবহার করে। এই জিনিসটি যশোদার হাতব্যাগের মধ্যে থাকত, হাতব্যাগ খুলে বার করে দিয়েছিল যশোদা। গন্ধটা লেগে রয়েছে।

ফেলে দিতে হবে! এই জিনিসটার মায়াও ত্যাগ করতে হবে! নিজস্ব বলতে এমন কোন জিনিস আছে তার যার ওপর তার মায়া আছে! নেই, কিছুই নেই। একটা রিস্টওয়াচ ছিল, কমদামী সাধারণ ঘড়ি, ঘড়িটা দিয়েছিলেন তার দাদামশাই। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতায় পড়তে এল যখন, তখন দাদামশাই ঘড়িটি তার হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। সেটাও বেচতে

হয়, বেচবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। এখন তার হাতে বাঁধা রয়েছে দামী ঘড়ি, ঘড়িটার ওপর তার মায়া নেই। দামী জুতো দামী পোশাক ঠাসা রয়েছে দামী বাক্সে, কোনও কিছুর ওপরেই তার মায়া নেই। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে ঐসব সামগ্রী তার নিজের সম্পত্তি। কয়েকবার সে থিয়েটার করেছিল কলেজে, নানারকমের সাজপোশাক পরত তখন। থিয়েটারের পরে সব খুলে দিয়ে নিজের কাপড় জামা পরে নিজের জায়গায় ফিরে আসত। এও সেই রকম, অভিনয় করছে অভিনয়ের সাজপোশাক পরে, অভিনয় সমাপ্ত হোলেই সমস্ত খুলে ফেলে নিজের পোশাক পরে নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তাই সে মনেও করতে পারে না যে বাক্সবোঝাই কাপড় জামা জুতো তার নিজের সম্পত্তি। নিজের সম্পত্তি বলতে একটি জিনিসই আছে, সেটিকে সে হাতে করে বসে রইল। ছেলেমানুষের মত বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ফেলে দিতে হবে, এটিকেও ফেলে দিতে হবে। যিনি এটিকে উপহার দিলেন, তিনিই বলে দিয়েছেন, এই জিনিসটির ওপর মায়া করতে নেই।

ফেলেই দেবে সে, গঙ্গায় ফেলে দেবে। এই মিষ্টি গন্ধটুকু সুদ্ধ অগাধ জলের তলায় পড়ে থাকবে। অনন্তকাল পড়ে থাকবে, কখনও কেউ জানতেও পারবে না।

"আপনি এমন মানুষ যে প্রয়োজন পড়লে বিনা দ্বিধায় আমার ওপরেও গুলি চালাতে পারেন।"

রিভলভারটিকে তুলে ধরল সে মুখের সামনে, রিভলভারটাই যেন যশোদা। ওটিকে সম্বোধন করে মনে মনে বলতে লাগল— "হাঁ, তোমার কাছ থেকেই আমি শিখেছি লক্ষ্যভেদ করতে। তুমি আমার গুরু, গুরুকে অসম্মান করছি না আমি। কিন্তু শুনে রাখ, তোমার কথা ফলবে না। আমি এমন মানুষ যে বিনা দ্বিধায়

আমি তোমার ওপরেও গুলি চালাতে পারি—কেমন! পারব না, কারণ সেটা সম্ভব হবে না কিছুতে। এই পাপ আমি বিদেয় করব, এই পাপ যদি হাতে না তুলি কখনও তা'হলে কেমন করে তোমার কথা ফলবে?"

রিভলভারটিকে আর বাক্সে পুরলে না। কাগজ মুড়ে প্যান্টের পকেটে ঢোকালে। ফেলেই যখন দিতে হবে গঙ্গায় তখন আর বাক্সে ঢুকিয়ে কি লাভ।

অর্ধেক রাতে ঘুম থেকে উঠে সেই প্যান্টটাই পরে ফেলল যোগজীবন, বসল গিয়ে দস্তিদারের ছোট্ট গাড়িতে। কৃষ্ণার ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছে না, চালাচ্ছে পাণ্ডা। পাণ্ডাকে যোগজীবন ভাল করে চেনে। পাণ্ডাই তাকে ওঠালে ঘুম থেকে, উঠিয়ে হিন্দী ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে অতি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। যশোদাকে পাওয়া যাচ্ছে না, সে ফেরেনি। সন্ধ্যার পরে বেরিয়েছে কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে, রাত দশটার মধ্যে ফেরার কথা ছিল। বেয়ারাকে বলে গেছে, রাত এগারটার মধ্যে যদি না ফেরে তা'হলে যোগজীবনকে সংবাদ দিতে হবে। যোগজীবন কোথায় থাকে তা' একমাত্র পাণ্ডাই জানে। তাই বেয়ারাটি পাণ্ডাকে গিয়ে জানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডা সেই বাড়িতে গিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে এসেছে।

"তুমি তা'হলে এখানেই আছ পাণ্ডা?" একটা কিছু বলতে হবে বলেই ও কথাটা বললে যোগজীবন।

"আমি হুকুমের চাকর"—পাণ্ডা জবাব দিল।

রাত তখন প্রায় শেষ হোতে চলেছে, শহরের পথে জল দেওয়া শুরু হোল। একটি ভদ্র গৃহস্থ পাড়ায় রাস্তার এক পাশে একখানি গাড়ি ঘণ্টা দুয়েক দাঁড়িয়ে আছে। পাড়া তখনও নিশুতি, উলটো দিক থেকে আর একখানি গাড়ি এসে সে রাস্তায় ঢুকল। যে গাড়িখানি দাঁড়িয়ে ছিল আগে থেকে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানির ইঞ্জিন চালু হোয়ে গেল। একটি লোক নামল সেই গাড়ি থেকে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দাঁড়াল গিয়ে উলটো দিকের বাড়ীর সামনে। পরে যে গাড়িখানি এল, সেখানি ঠিক তার পাশে এসে থেমে গেল।

টাকমাথা এক ভদ্রলোক নামলেন সেই গাড়ি থেকে। নেমেই সামনে একজনকে দেখে জড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে, কে দাঁড়িয়ে ওখানে?"

"আমি রঘুদা।"

"আমিটি কে, তাই বল বাবা। এ সময় কি মানুষ চেনার ক্ষমতা আছে আমার।"

যে গাড়ীখানি থেকে তিনি নামলেন, সেই গাড়ির ভেতর হাসির হুল্লোড় উঠল। নারী পুরুষের মিলিত কণ্ঠের হাসি, হাসির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে বোতলের মহিমা আত্মপ্রকাশ করছে। সে গাড়ি দাঁড়াল না, হাস্যসংকুল অবস্থায় উড়ে বেরিয়ে গেল। অন্য গাড়িখানি ততক্ষণে ঠিক সেই জায়গায় সরে এসেছে।

রঘুদা বললেন—"এত রাত্রে তুমি কে বাপু?"

ততক্ষণে গাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছে।

রঘুদা এক পা সামনে এগলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটি মুষ্ট্যাঘাত পড়ল তাঁর নাকের ওপর। টুঁ শব্দটি করতে পারলেন না তিনি, উলটে পড়লেন পিছনে দাঁড়ান ড্রাইভারের আলিঙ্গনের মধ্যে। সে বেচারা বেঁটে মানুষ, কিন্তু শক্তি রাখে। টেনে হিঁচড়ে চক্ষের

নিমেষে সে রঘুদার বপুটিকে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে ফেললে। তারপর সে গাড়িখানিও সেই পাড়া থেকে বেরিয়ে গেল। ভদ্র গৃহস্থ পাড়ায় ভোর রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল না।

সকাল হোয়ে গেছে তখন, গাড়িখানি দাঁড়িয়ে আছে রেস কোর্সের পাশে বিরাট এক গাছের তলায়। গাছতলার আঁধার তখনও কাটেনি।

যোগজীবন বললে—"এখনও সত্যি কথা বলুন, কোথায় গেছে যশোদা। নয়তো আপনাকে শেষ করে ঐ মাঠের মধ্যে ফেলে রেখে যাব।"

লোকটি গোঁ গোঁ করে উঠল—"কে যশোদা? যশোদাকে আমি চিনি না।"

পাণ্ডা নেমে এল নিজের জায়গা থেকে হাতে একখানি চকচকে কুকরি নিয়ে। এধারের দরজা খুলে কুকরিখানি তার নাকের সামনে ধরে বললে—"সি"

যোগজীবন বললে—"এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব আমি। তার মধ্যে আপনি বলবেন কোথায় আছে যশোদা। এই আমি গুনতে শুরু করলাম। এক দুই তিন চার—"

গাড়ির ভেতর উঠে পড়ল পাণ্ডা, কুকরিখানি লোকটার গলার ওপর ঠেকিয়ে রাখলে।

সাত পর্যন্ত গোনবার আগেই লোকটি প্রায় ককিয়ে কেঁদে উঠল—"বলছি বলছি"

যোগজীবন বললে—"যদি মিথ্যে হয়—"

পাণ্ডা তার অদ্ভুত ভাষায় বুঝিয়ে দিলে—"এখন এর মুখ বেঁধে

ফেলে রাখা হবে এই গাড়িতেই, মিথ্যে হোলে পরে জবাই করা হবে।"

কয়েক মিনিট পরে গাড়িখানি শহর ছাড়িয়ে শিল্পাঞ্চলের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল। অনেক দূর তাকে পাড়ি দিতে হবে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হোল। তখনও সমানে জেরা চলছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় জেরা করতে হোলে নাকি লম্বা সময় লাগে। বিশ ঘণ্টার ওপর একভাবে বসে আছে যশোদা, দু'ঘণ্টা অন্তর জেরা করার লোক পালটে যাচ্ছে। সবাই শিক্ষিত লোক, সবাই ভদ্রসন্তান। ভদ্র ভাবেই সবাই জেরা করছেন। গোপিকারমণ দস্তিদারের মেয়ে যখন তুমি তখন নিশ্চয়ই জান দস্তিদারের সব কীর্তিকলাপ। বল, বলতেই হবে, কে কে আছে দস্তিদারের সঙ্গে তা' বল। অস্ত্রশস্ত্র কি কি যোগাড় করেছে তা' বল। পাহাড়ী শহরের সেই চীনে বস্তিটা কারা ধ্বংস করলে তা' বল।

যশোদার এক কথা—"কিছু জানি না আমি, বাবা কি করে না করে তা' আমি জানব কেমন করে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা কিছুই করে না।"

অবশেষে ওঁরা হার মানতে বাধ্য হোলেন। ওঁদের স্বরূপ প্রকাশ হোতে শুরু করল। একসঙ্গে সব ক'জন তখন উপস্থিত হোলেন সেই ঘরে। তৈরী হোয়েই ঢুকলেন সবাই, সর্বহারা মার্কা মহোৎসব শুরু হবে।

যশোদাও তৈরী হোল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সব ক'জনকে। যে লোকটি প্রথমে তার গায়ে হাত দেবে, তার নিস্তার

নেই। তার শখটা জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে নিশ্চয়ই, তারপর যা হবার হবে।

প্রথমে কেউই এগোয় না। গেলাস এল, বোতল এল। গেলাসে গেলাসে পানীয় ঢালা হোল। একটি গেলাস যশোদার সামনে রেখে সবাই অনুরোধ করলেন—"খাও, খেয়ে ফেল ওটুকু। এতক্ষণ যা হোয়েছে ভুলে যাও, এবার একটু খাওয়াদাওয়া হোক। তারপর চল, তোমাকে তোমার জায়গায় ফিরিয়ে দিয়ে আসছি।"

যশোদা জিজ্ঞাসা করল—"সে জায়গাটা কোথায় ?"

ওঁদের মধ্যে দু'চারজন তখন ঢেলে ফেলেছেন গলায় পানীয়। একজন দিলদরিয়া হোয়ে পড়লেন। বললেন—"কোথায় আর যাবে মাইরি। আমরা তোমায় ছাড়ব না। আমরা কি মানুষ নই। আমাদের ফেলে যাবে কোথায়।"

আর একজন আর একটু সাহস দেখিয়ে ফেললেন। উঠে গিয়ে এক হাতে যশোদার গলা জড়িয়ে ধরে গেলাসটা মুখের কাছে তুলে ধরলেন। আবদেরে সুরে বললেন—"খাওনা মাইরি, খেলেই মনের কপাট খুলে যাবে।"

যশোদা নিল তার হাত থেকে গেলাসটা। লোকটা তার মুখখানা যশোদার মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে গেল। হঠাৎ যশোদার গেলাসধরা হাতখানা ছিটকে উঠল ওপর দিকে, নামল লোকটার কপালের ওপর। গেলাসটা ভেঙে পড়ল। আর্তনাদ করে উঠে লোকটাও ঘুরে পড়ল।

চার পাঁচজন একসঙ্গে তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। যশোদার খালিহাত, চেয়ার ছেড়ে সেও উঠে দাঁড়াল।

কে একজন হুকুম দিলেন—"ধর, ধরে ফেল।"

ওঁরা হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হোল ঘরের মধ্যে। আর একটি লোক

হুমড়ি খেয়ে পড়ল যশোদার পায়ের কাছে। ঘরের কোণ থেকে অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে কে ঘোষণা করলে—"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নড়বেন না, এখনও পাঁচটা গুলি আছে এই অস্ত্রটায়, পাঁচটাই খরচা করে ফেলব।"

সদাজাগ্রত মহাকাল।

মহাকাল ঘুমতে পারেন না, তাঁর কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

বম্বেটেদের বানানো আদিকালের সেই অট্টালিকার নীচের তলায় মুখ লুকিয়ে মহাকাল গুমরে গুমরে কাঁদেন।

সেখানকার সভাপতির সেই ঘুমে জড়ানো কণ্ঠ নীরব। নারীকণ্ঠে একটি কাহিনী শোনানো হচ্ছে।

"দস্তিদারের মেয়ে যশোদাকে যুবসম্মিলনে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যুবসম্মিলন থেকে সোজা নিয়ে যায় সেই শিল্প-নগরীতে। বিশ ঘণ্টার বেশী তাকে জেরা করে। তারপর তারা স্বরূপ প্রকাশ করে। চরম অপমানটা করতে পারেনি। তার আগেই আমাদের এক বিশিষ্ট কর্মী সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। ছ'টি গুলি ছিল তার রিভলভারে। পাঁচটি খরচা করে পাঁচটি দুশমনকে তিনি খতম করেন, শেষ গুলিটি দিয়ে যশোদাকে বাঁচান।"

"বাঁচান মানে।"

"শেষ গুলিটি যশোদার বুকে লাগে। চরম নির্যাতনের হাত থেকে যশোদা রক্ষা পায়।"

অনেকক্ষণ পরে আর একটি মাত্র প্রশ্ন হোল—"আমাদের সেই কর্মীটির নাম কি ?

"যোগজীবন রায়। নামটি আপনারা সবাই জানেন। এইখানে তিনি নিজের নাম পরিচয় নিজেই দিয়ে গেছেন।"

ঢং ঢং

মহাকালের কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। সভা সমাপ্ত হোল।

চাকার মত গোল আধ ইঞ্চি পুরু নিরেট কাঁসা দিয়ে তৈরী মহাকালের কপাল ঝুলছে জেলখানার গেটে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় হাতুড়ির ঘা পড়ছে। যাদের হুকুম হোয়ে গেছে, তারা সেই ঘা শুনে হিসেব করছে। ঘণ্টা হিসেব করছে, কত ঘণ্টা বেঁচে রইল হিসেব রাখা চাই।

আবার এমন মানুষও আছে, ফাঁসির হুকুম হবার পরে যে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়।

অনেকগুলো খুন করেছে বলে একটা লোকের ফাঁসির হুকুম হোয়েছে। লোকটা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। দিবারাত্র অঘোরে ঘুমচ্ছে। ওকে যে মরতে হবে, তা' যেন ও জানেই না।

জেলখানার গেটের দরজায় ঝুলছে মহাকালের কপাল। কপালে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। মহাকাল জেগে আছে। ফাঁসির আসামী ঘুমচ্ছে। মহাকালকে সে পরোয়া করে না।

হতভাগ্য মহাকাল!

বিষাণ বাজছে—জাগো জাগো। সদা সর্বক্ষণ সজাগ থাক। ঈশান কোণে পীতঝঞ্ঝা দেখা দিয়েছে। ফেরাও, ফেরাও, মরনপণ করে পীতঝঞ্ঝাকে বিদেয় কর।

ইঙ্গিত—বিষাণে ঈশানের ইঙ্গিত।

—শেষ—